ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৮ অক্টোবর- ডিসেম্বর-২০০৬

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৮

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

---

*Published by Advocate **MUHAMMAD NAZRUL ISLAM** General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

আইন তৈরি করা হয় মেনে চলার জন্য

দুনিয়ায় বাস করে আমরা কয়েক প্রকার আইন দেখছি উপলব্ধি করছি এবং তার সাথে পরিচিত হচ্ছি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে প্রকৃতির আইন। এ আইন একেবারে অমোঘ অপরিবর্তনীয়। এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বিশৃংখলা নেই। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পথে ঘাটে প্রতিনিয়ত আমরা এ আইন প্রত্যক্ষ করছি। প্রকৃতির সবকিছু যথানিয়মে চলছে, আবর্তিত হচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্র সূর্য পাহাড় নদী গাছপালা ইত্যাদি বড় বড় দৃশ্যমানরাই শুধু নয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটানুকীট শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না এমন সব ব্যাকটেরিয়াও অদৃশ্য নিয়মের শৃংখলে আবদ্ধ।

মানুষের শরীরটাও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক আইনের অধীন। শরীরের ভেতরের রক্ত প্রবাহ প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলে। আমরা যে খাই প্রকৃতি সে চাহিদা সৃষ্টি করে দেয়। তাই খাওয়ার ইচ্ছাকে ক্ষুধা বলা হয়। এই ইচ্ছা প্রকৃতি তৈরি করে দেয়। আমাদের কারণে এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বা অনিয়ম দেখা দিলে চিকিৎসার মাধ্যমে আবার সেই অনিয়ম দূর করার জন্য প্রকৃতির আইন ও নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু প্রকৃতির আইনকে টপকে যাবার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই।

প্রকৃতির এ আইন যে মহান সর্বশক্তিমান সত্তার অধীন তিনি আবার আমাদের জন্য কিছু আইন তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য। প্রাকৃতিক আইনের সাথে এ আইনের একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আমরা চাই বা না চাই প্রাকৃতিক আইন আমাদের মেনে চলতেই হবে। কিন্তু এই মহান সর্বশক্তিমান সত্তার আইন আমরা মানতেও পারি আবার না মানতেও পারি এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আমাদের আছে। মানলে আমাদের লাভ, না মানলে ক্ষতি এটাও একটা অবধারিত সত্য।

তৃতীয় একটা আইন আমরা নিজেরাই তৈরি করছি নিজেদের জন্য। এ সিলসিলা সুদীর্ঘ কাল থেকে চলে আসছে। আমরা বুদ্ধিমান জীব। ভালোভাবে দুনিয়ায় বাঁচতে চাই। সুখে শান্তিতে আরামে আয়েশে জীবন যাপন করতে চাই। জীবনকে উপভোগ করতে চই। তাই আমরা

আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই। বিচার বিশ্লেষণ করি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে ডুবুরীর মতো সেখান থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনি। আমরা নিজের অধিকার আদায় করতে চাই। আবার অন্যেরা যাতে আমার অধিকার হরণ করতে না পারে সেদিকেও কড়া নজর রাখি। এভাবে সবদিক ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা আইন তৈরি করি। আইনের অষ্টোপাশে নিজেদের বেঁধে ফেলি। আইন ও নিয়ম শৃংখলার আওতাধীনে থাকাতেই আমরা নিরাপদ মনে করি।

তাই আইন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ আইনগুলো আমরা তৈরি করেছি আমাদের জন্য। এগুলো প্রাকৃতিক আইন নয় যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এর অধীনে আমাদের থাকতেই হবে। অথবা আল্লাহর আইনও নয় যে চাইলে মানতে পারি আবার চাইলে না মানতেও পারি। বরং এগুলো আমরা তৈরি করেছি আমাদের নিজেদের জন্য। আমরা যদি এগুলো অন্যের ওপর চাপিয়ে দেই কিন্তু নিজেরা না মানি তাহলে এর সুফল আসলে আমরা পাবো না। কারণ আইনের সুফল এর মেনে চলার মধ্যে রয়েছে। সবার মেনে চলার মধ্যে। একজন মানবে এবং আর একজন মানবে না তাহলে আসলে আইনের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। কারণ সবার সম্মিলিত মানার ফলেই শৃংখলার সৃষ্টি হয়। একজন না মানলে শৃংখলা ব্যাহত হয়। আর এজন্যই শাস্তির বিধান। না মানার ফলে শৃংখলা ভংগ হলো, একজনের শৃংখলা ভংগ সবাইকে স্পর্শ করলো, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাই শাস্তি।

তাই আইন ভংগ একটা অপরাধ। মস্ত বড় অপরাধ। বিশেষ করে যারা আইন তৈরি করেছে এবং যারা আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য এটা একটা মারাত্মক ও ভয়াবহ অপরাধ। গত ৩০ নভেম্বর সুপ্রীমকোর্ট আঙিনায় একদল আইনজীবীর যে নজিরবিহীন কর্মকাণ্ড আমরা দেখলাম তা মূলত আইন ও আদালতের অভিভাবকের পবিত্র দায়িত্বকে কলংকিত করেছে। ঘটনাটা ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে যে তিনটে রীট পিটিশান দায়ের করা হয়েছিল তার শুনানীর পর রায় ঘোষণার অপেক্ষা চলছিল। এমন সময় মাননীয় প্রধান বিচারপতি রায়ের ঘোষণা স্থগিত রেখে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করার আদেশ দেন। আর এ আদেশ দেবার অধিকার প্রধান বিচারপতির আছে বলে এ্যাটর্নি জেনারেল দাবী করেছেন। তাছাড়া প্রধান বিচারপতির স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগও রয়েছে। এই আইনী পন্থা গ্রহণ না করে রীট পিটিশনকারী আইনজীবীরা এবং তাদের অনুগত ক্যাডাররা প্রধান বিচারপতি ও এ্যাটর্নি জেনারেলের কক্ষ ভাংচুর, গাড়ি জ্বালানো এবং প্রতিপক্ষ আইনজীবীদের ওপর হামলা করে সুপ্রীমকোর্ট অংগনে যে নজিরবিহীন গুণ্ডামি ও পেশী শক্তি প্রদর্শন করেন তা মোটেই আইনের ভাষা নয়। বিশেষ করে দেশের পনের কোটি জনগণের সর্বোচ্চ আইনগত আশ্রয়স্থলের এহেন অবমাননা জাতির কপালে একটা কলংকের টীকা হয়ে বিরাজ করবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এ অবমাননা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটা

কলংকজনক অধ্যায় হয়ে গেছে। এটা কোনো তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রসূত অঘটন না পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা সেটা বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে দেশের আইনজীবীদের একটা গোষ্ঠীর মধ্যে আইনকে নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নেবার এবং আইনী লড়াইয়ে পেশী শক্তি ব্যবহারের এই প্রবণতা শুভ লক্ষণ নয়।

এ প্রবণতা রোধ করতে হবে। আইনের সাহায্যেই এই আইন ভংগ করার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আইনভংগকারীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত না তারা আইনের শাসন মেনে নেয়। তারা কেন কেউ আইনের উর্ধে থকাতে পারবে না। আইন মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আইনের শক্তি। কাজেই আইন তৈরি করে যদি তা মেনে না চলা হয় তাহলে তা শক্তিহীন ও অকল্যাণকর হয়ে পড়বে।

–আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ৯-৩৬

ইসলামের ইতিহাসে উগ্রপন্থী দল এবং তাদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিভংগি

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সাধারণ পরিচিতি

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ, জঙ্গিবাদী শব্দগুলো ইংরেজি militant ও militancy শব্দগুলোর অনুবাদ। ইদানীং এগুলো প্রচার মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত। কিছু দিন আগেও শব্দগুলোর এতো ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। আর আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবে এগুলো নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপকভাবে যোদ্ধা বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্ত্র বুঝাতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[১]

শক্তিমত্তা বা উগ্রতা বুঝাতেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে বলা হয়েছে, militant. adj. favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. ...militant: n. militant person, esp. in politics.[২]

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary-তে বলা হয়েছে, militant 1: engaged in warfare or combat : fighting. 2: aggressively active (as in a cause).

এ সকল অর্থে কোনোটিই বেআইনী অপরাধ বুঝায় না। কিন্তু বর্তমানে 'জঙ্গি' বলতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষে বেআইনীভাবে নিরপরাধ বা অযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। আর এদের মতবাদকেই জঙ্গিবাদ বলা হয়। এই অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থা।

সন্ত্রাস-এর পরিচয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে : terrorsim: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.

'সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।'

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ.বি.আই) terrorism বা সন্ত্রাসের সংগায় বলেছে: government, the civilian population. or any segment thereof, in furtherance.

'কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।'

এই সংগায় মূল কর্মের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বেআইনী হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে। আর যদি তা 'আইন-সম্মত' হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা হলো, আইন ও বেআইন নির্ণয় নিয়ে। এভাবে আমরা দেখছি যে, এভাবে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য অন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংগায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়: terrorism is premeditated. politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets.

'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষের বিরুদ্ধে সহিংসতা হলো সন্ত্রাস।'

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম উগ্রপন্থী দল

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া সাধারণভাবে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য হলো: যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে উগ্রপন্থী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এজন্য তারা তাদের বিপক্ষ যোদ্ধা-অযোদ্ধা সবাইকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তাদের প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করতে থাকে। যাতে এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট 'রাজনৈতিক পরিবর্তন' করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করে তারাই এরূপ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়।

মানব ইতিাসের সন্ত্রাসের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামের নামে সন্ত্রাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে চিন্তা করা। প্রাচীন যুগ থেকে ইহুদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ' প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধতম সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহুদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রবাদী এ সকল ইহুদী নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন

ছিল। যে সকল ইহুদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহঅবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য এরা সিকারী (the Sicarii: daggermen) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে জীবিত ধরা দিত না।[৩] মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (both the Reformation and the Counter-Reformation)-এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভূত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।[৪]

ইসলামে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত কোনো প্রকার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রাণ বা সম্পদের ক্ষতি করা অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণে ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের ঘটনা কম। ইসলামের ইতিহাসে আমরা যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখতে পাই। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ হয়েছে। যেমন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। এ জাতীয় যে সামান্য কিছু ঘটনা আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে অন্যতম খারিজীদের কর্মকাণ্ড। সমকালীন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের কারণ ও প্রতিকার জানার জন্য এদের কর্মকাণ্ড এবং এদের সন্ত্রাস মুকাবিলায় সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। কেননা প্রেক্ষাপট, কারণ ও তত্ত্ব সকল দিক থেকেই আধুনিক জঙ্গিবাদ প্রাচীন জঙ্গিবাদের সাথে একই সূত্রে বাঁধা।

খারিজী সম্প্রদায় : উৎপত্তি ও ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাসে উগ্রবাদের প্রথম ঘটনা আমরা দেখতে পাই খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উসমান ইবন আফ্ফান রা. কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তারা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে হযরত আলী রা. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসিলম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু হযরত উসমান রা. নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর হযরত মু'আবিয়া রা. আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে দু'পক্ষের যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয় পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য সালিসী মজলিস গঠন করেন।

এই পর্যায়ে আলীর রা. অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করে। এদেরকে 'খারিজী' (দলত্যাগী) বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিল ইসলামের দ্বিতীয় যুগের মানুষ, যারা রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর ইসলাম গ্রহণ করে। এদের প্রায় সকলেই ছিল যুবক। এরা ছিল অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সারাদিন যিকর ও কুরআন অধ্যয়নে রত থাকার কারণে এরা 'কুররা' বা 'কুরআন বিশেষজ্ঞ' বলে সুপরিচিত ছিল। এরা দাবি করে যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান হলো, অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও যদি তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তোমরা জুলুমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।'[৫]

এখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ।

এছাড়া কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : 'কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা 'বিধান শুধু আল্লাহরই।'[৬] কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।'[৭] উক্ত আয়াতসমূহের মর্ম উপলব্ধি না করতে পেরে করে খারিজীরা বলে যে, আলী ও তাঁর অনুগামীগণ যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করে, আলী রা. মু'আবিয়া রা. ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে।

তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে এই মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রসূলুল্লাহ-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করে। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোসকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[৮]

সালিসি ব্যবস্থা আলী রা. ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে,

আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বছর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে উন্নীত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর রা. দল ত্যাগ করে। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার খারিজী বিদ্রোহী উপস্থিত ছিল।[৯]

আরবী সাহিত্যে রচিত এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণায় ভরপুর।[১০] এদের নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[১১] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যেত।[১২] পাশাপাশি এদের উগ্রতা ও হিংস্রতা ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় এদের হিংস্রতার কারণে।

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের গুপ্ত হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রা. ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলী রা.-কে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান রা. ও আলী রা.-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছেন। এছাড়া মু'আবিয়া ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. তাদের এ দাবি না মানলে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[১৩]

তারা মনে করতো যে, ইসলামী বিধিবিধানের সামান্য লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। এজন্য তারা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং পাশাপাশি গুপ্ত হত্যা করে। এছাড়া যারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে।[১৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবী আলী রা. ও মু'আবিয়া রা. এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেন, 'যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০

জন সাহাবীও এতে অংশগ্রহণ করেননি। এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।'[১৫]

এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়গণ নৈতিকভাবে আলীর রা. কর্ম সমর্থন করতেন। তাঁকে পাপী বা ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই রাজি হতেন না। খারিজীরা এদেরকেও কাফির বলে গণ্য করতো এবং হত্যা করতো।

সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রী-পরিজনদের নিয়ে পথে চলছিলেন। খারিজীরা তাঁকে উসমান রা. ও আলী রা. সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে জবাই করে এবং তাঁর গর্ভবর্তী স্ত্রী ও কাফেলার অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। এ সময়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম করতে বসে। সেখানে একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়লে একজন খারিজী তা তুলে নিয়ে মুখে দেয়। তখন অন্য একজন বলে, তুমি মূল্য না দিয়ে পরের দ্রব্য ভক্ষণ করলে? লোকটি তাড়াতাড়ি খেজুরটি উগরে ফেলে দেয়। আকেরজন খারিজী একটি শূকর দেখে তার দেহে নিজের তরবারি দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলে, এতো অন্যায়, তুমি এভাবে আল্লাহর যমীনে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছ ও পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন সেই খারিজী শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[১৬]

রসূলুল্লাহ স.-এর ভবিষ্যদ্বাণী

রসূলুল্লাহ স. এদের ধর্মনিষ্ঠা ও উগ্রতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবূ সাঈদ আল খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন: 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের সামনে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে, যাদের সিয়ামের সামনে তোমাদের সিয়াম তুচ্ছ মনে হবে, যাদের সৎকর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য মনে হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।'[১৭]

এই অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধর্মনিষ্ঠা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সবর্জনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম প্রতিফলন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[১৮]

রসূলুল্লাহ স.-এর প্রায় অর্ধশত হাদীস থেকে আমরা এদের বিভ্রান্তির কারণ ও এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, ইয়ামন থেকে আলী রা. মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। রসূল স. উক্ত স্বর্ণ ৪ জন নওমুসলিম আরবীয় নেতার মধ্যে বন্টন করে দেন। তখন বসা চক্ষু, উচু গাল, বড় কপাল ও মুণ্ডিত চুল বিশিষ্ট যুলখুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে:

'হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে-ইনসাফি করলেন! তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমার! পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বড় কর্তব্য কি আমার নয়? আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি বা বে-ইনসাফি করি তবে আল্লাহর আনুগত্য এবং ন্যায় বিচার আর কে করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করলেন, আর তোমরা আমার বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারছ না! এরপর লোকটি চলে গেল। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি কি লোকটিকে (রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি অবিশ্বাস ও কুধারণা পোষণ করে ধর্মত্যাগ ও কুফরী করার অপরাধে) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করব না? তিনি বলেন, না। হয়তোবা লোকটি সালাত আদায় করে। খালিদ রা. বলেন, কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই। তখন রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেঁড়ে দেখব। অতঃপর তিনি গমণরত উক্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, এই ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্যে এমন একদল মানুষ বের হবে যারা সদাসর্বদা সুন্দর-হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে, অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের সালাত দেখে তোমাদের কেউ নিজের সালাতকে তুচ্ছজ্ঞান করবে, তাদের সিয়াম দেখে কেউ নিজের সিয়ামকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়, এরাও তেমনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।[১৯]

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, যুলখুওয়াইসিরা বা হুরকূস নামক এই ব্যক্তি খারিজীদের গুরুজনদের একজন ছিল।[২০]

এখানে এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তির মূল কারণটি প্রতিভাত হয়েছে। তা হলো, ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের উপলব্ধিকেই সঠিক মনে করা এবং এই উপলব্ধির বিপরীত সকলকেই অন্যায়কারী মনে করা। এখানে রসূলুল্লাহ স. রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি সকল যোদ্ধার মধ্যে বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা বণ্টন না করে অল্প কয়েকজনকে তা দিয়েছেন। এতে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মুমিন নিজের মনকে বুঝাতে পারেন যে, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে বা আল্লাহর বিশেষ নির্দেশেই রসূলুল্লাহ স. তা করেছেন। অথবা তিনি সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-কে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনো রসূলুল্লাহ স.-কে অন্যায়কারী বলে কল্পনা করতে পারেন না বা তাঁকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার কথা বলতে পারেন না।

কিন্তু এই ব্যক্তি দীনকে বুঝার ব্যাপারে নিজের জ্ঞানকেই চূড়ান্ত মনে করেছে। সে তার জ্ঞান দিয়ে অনুভব করেছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ সে রসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহকে ভয় করতে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়ে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ও তাকে অবিশ্বাস করে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করে বেঈমান হয়ে যায় অথচ সে নিজেকে সঠিক ধর্মনিষ্ঠ

মনে করে। পরবর্তীতে এর অনুসারীরা মূলত 'মুসলিমদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। 'মুরতাদ', 'কাফির' ইত্যাদি অভিযোগে এরা মুসলিমদেরকে হত্যা করে।

আলী রা. এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'আখেরী যমানায় এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা হবে বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগলভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।'[২১]

এখানে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীকর্মে লিপ্তদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে: এক. এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। 'যুল খুওয়াইসিরা'র মত দু'চারজন বয়স্ক মানুষ এদের মধ্যে থাকলেও এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না। দুই. এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষে পরিচালিত হয়েছে। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদূরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করছিল।

এদের বিদ্রোহের পরে হযরত আলী রা. এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জমায়েত হতে থাকে। একপর্যায়ে তারা একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নয় যে, যেহেতু আলী রা. ও মুআবিয়া রা. মুসিলম উম্মাহকে ইসলাম বিরোধিতা ও খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গোপনে হত্যা করলেই জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রহমান ইবনু মুলজিম নামে এক ব্যক্তি ৪০ হিজরীর রমযান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী রা. যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত হানে। আলী রা.-র শাহাদতের পরে তাঁর উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করেনি, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আল্লাহর যিকির করতে করতে আমি শহীদ হতে চাই।[২২]

আলী রা.-কে এভাবে গুপ্ত হত্যা করাতে আব্দুর রহমানের প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (মৃত্যু ৮৪ হি.) বলেন, 'কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চাননি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।'[২৩]

হযরত আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবী এদের ধর্ম নিষ্ঠার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদের উগ্রতা পরিহার করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে। আলী রা.-কে প্রশ্ন করা হয়, এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিকির করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও স্বমতে অবিচল থাকায় ফিতনায় নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[২৪]

বিভ্রান্তির কারণ : জ্ঞানের অহঙ্কার

ইসলামের ইতিহাসের এই প্রথম সন্ত্রাসী ঘটনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানের অহঙ্কারই ছিল তাদের বিভ্রান্তির উৎস। আমরা দেখেছি যে, রসূলুল্লাহ স. এরূপ উগ্রতায় লিপ্তদের দু'টি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন: তারুণ্য এবং বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা হঠকারিতা। তাই তারা ইসলাম বুঝার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের দৃষ্টিভংগীকেই চূড়ান্ত মনে করতো। রসূলুল্লাহ স.-এর আজীবনের সহচর ও দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করা বা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করাকে তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করতো। তাদের বুঝের বাইরে মতপ্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করতো।[২৫]

এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা হাদীস একবারে অস্বীকার করতো না। কখনো কখনো সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তারা হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করতো ও প্রশ্ন করতো।[২৬] কিন্তু ইসলামী জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কুরআনকেই তারা যথেষ্ট মনে করতো। রাতদিন তারা কুরআন পাঠ ও চর্চায় রত থাকতো। কুরআন বুঝার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যক্তিগত কর্ম, ব্যাখ্যা বা হাদীসের গুরুত্ব তারা অস্বীকার করতো। কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যা তারা বুঝতো তাকেই চূড়ান্ত মনে করতো।[২৭]

শুরু থেকেই সাহাবীগণ এদের বিভ্রান্তির কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তারা 'সুন্নাত'-এর মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করতেন। আলী রা. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে তাদেরকে বুঝানোর জন্য পাঠানোর প্রাক্কালে বলেন, 'তুমি তাদের কাছে যাও, তাদের সাথে আলোচনা-বিতর্কে লিপ্ত হও। তাদের সাথে কুরআন দিয়ে বিতর্ক করো না; কারণ কুরআন বিভিন্ন

ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বরং তুমি সুন্নাত দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করবে।... ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমার বেশি, আমাদের বাড়িতেই তো কুরআন নাযিল হয়েছে। আলী রা. বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তবে কুরআন বিভিন্ন প্রকারের অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, আমরাও কুরআনের কথা বলবো এবং তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করবে, তাহলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো পথ পাবে না।'[২৮]

এ বিষয়ে উমর রা.-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি বলেন: 'অচিরেই কিছু মানুষ আসবে যারা কুরআনের অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যাদি দিয়ে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। তোমরা তাদেরকে সুন্নাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। কারণ সুন্নাতের জ্ঞানে অভিজ্ঞ মানুষরা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কেও অধিক অভিজ্ঞ।'[২৯]

মুসলিমকে কাফির বলা

খারিজীদের দৃষ্টিভংগীতে কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের আলোকে আল্লাহর বিধানমত ফয়সালা না দেয়ার কারণে তারা আলী ও তাঁর অনুগামীদেরকে কাফির বলতো। তারা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির হয়ে যায়। তাদের মতে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে কাফিরে পরিণত হয়। ঈমান ও কুফরের মাঝে কোনো মধ্যবর্তী অবস্থা নেই। কাজেই যার ঈমানের পূর্ণতা নষ্ট হবে সে কাফিরে পরিণত হবে।[৩০]

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অনেক বিষয় আছে যা কুরআন-হাদীসের আলোকে স্পষ্টতই পাপ। যেমন-চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি। খারিজীরা শুধু এগুলোকেই কুফরী বলে গণ্য করেনি, উপরন্তু তাদের মতের বিপরীতে রাজনৈতিক কর্ম বা সিদ্ধান্তকেও 'পাপ' বলে গণ্য করেছে। এরপর তারা সেই পাপকে কুফরী বলে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে খারিজীদের কাফির কথনের মূল ভিত্তি 'পাপ' নয়, বরং 'রাজনৈতিক মতাদর্শ'। তারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এরূপ সকল মুসলিমকে কাফির বলতো।

আলী রা. ও তাঁর পক্ষের লোকজন এবং অন্যান্য যে সকল সাহাবী ও সাধারণ মুসলিম আলী রা.-কে কাফির বা ইসলামের বিধান লঙ্ঘনকারী বলে মানতে রাজি ছিলেন না, তারা চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার বা কুরআন নির্দেশ অনুরূপ কোনো পাপ বা অপরাধে লিপ্ত হননি। আলী রা. তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ করতে সালিসের বা আপোসের চেষ্টা করেছেন। তাঁর কর্মের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন রয়েছে। অন্য অনেকে তাঁর সাথে তার কর্মে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মের যৌক্তিকতা অনুভব করেছেন। খারিজীরা তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এদের সকলকেই কাফির বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ লুট করে কথিত সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে। পক্ষান্তরে তারা তাদের মধ্যকার পাপীকে কাফির মনে করতো না।'[৩১]

কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা : কাউকে কাফির বলে গণ্য করা আর তাকে হত্যা করা কখনো এক বিষয় নয়। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত কাফির ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। কিন্তু খারিজীরা সাহাবীগণ ও সাধারণ মুসলিমদেরকে কাফির বলেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা করার বৈধতা দিয়েছে। তারা মুসলিম দেশকে 'দারুল কুফর' বা অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছে এবং তারা মুসলিম নাগরিকদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার বৈধতা ঘোষণা করেছে। অবশ্য তারা মুসলিমদেরকেই হত্যা করেছে এবং অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছে।[৩২]

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা

ইসলামের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. গোত্র কেন্দ্রিক শতধাবিভক্ত আরব সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। আরবরা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করতো। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে তাদের মতের বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্ররোচিত করতো।

রসূলুল্লাহ স. এই বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি এজন্য বারবার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা 'আল-জামা'আত', রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য বা 'আল-ইমাম', বা 'আল-আমীর' রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ বা 'বাইয়াত' ইত্যাদির বিষয়ে তাঁর অগণিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এই অবস্থার মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। পছন্দ হোক বা না হোক মুসলিম রাষ্ট্র প্রশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে গণমানুষের অশান্তি ও ক্ষয়ক্ষতি করা যাবে না। সংঘাতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রধানকে সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

সুন্নাতে নববী ও সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে কুরআন ও ইসলাম বুঝতে গিয়ে খারিজীরা মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। 'ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের প্রতিরোধ'-এর নামে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য অস্বীকার করে। এছাড়া তারা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে অক্ষম হয়। তারা শুধু বলতো 'কর্তৃত্ব বা বিধান কেবলমাত্র আল্লাহরই'। এ দ্বারা তারা বুঝাতো, আল্লাহ ছাড়া কোনো শাসন বা কর্তৃত্ব চলবে না। আল্লাহর বিধান যে যেভাবে বুঝবে সেভাবে পালন করবে।

এভাবে প্রথমে খারিজীগণ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রশাসনের কোনো গুরুত্ব স্বীকার করত না। পরবর্তীতে কেউ কেউ তাদেরকে রাষ্ট্র, ইমাম, বাইয়াত ইত্যাদির গুরুত্বের বিষয়ে বললে তারা

তাদের মধ্য থেকে একজনকে 'আমীর' বা ইমাম বলে 'বাইয়াত' করে নেয়। এভাবে তারা রাষ্ট্রীয় পরিভাষাগুলোকে 'দলের' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র বিষয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম নেয়।[৩৩]

জিহাদকে ইসলামের রুকন ও ব্যক্তিগত ফরয বলে গণ্য করা

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং জিহাদের জন্য মহান পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়াও মুসলিম-অমুসলিম সকলের মধ্যে 'সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করতে' নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফলে খারিজীরা রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতো না। তারা জিহাদ ও 'আদেশ-নিষেধ' বিষয়ক কুরআনী নির্দেশনার আলোকে প্রচার করে যে, জিহাদ ও আদেশ-নিষেধ ইসলামের রুকন ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

'খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জিহাদ। খারিজীরা জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন বলে মনে করে। অধিকাংশ মুসলিমের মতের বিপরীতে খারিজীরা কুরআন নির্দেশমত 'সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ' বলতে তরবারির জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো।... তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে... ।'[৩৪]

প্রকৃতপক্ষে তারা 'জিহাদ'-কে ইসলামের সবচেয়ে বড় করুন মনে করতো 'জিহাদের' নামে ইসলামে নিষিদ্ধ খুনখারাবিতে লিপ্ত হতো। এটিই ছিল তাদের মারাত্মক বিভ্রান্তি। কোনো মুসলিমকে কাফির বলা কঠিন বিভ্রান্তি। তা সন্ত্রাসের পথ উন্মুক্ত করে। ঢালাওভাবে যোদ্ধা-অযোদ্ধা সকল কাফিরকে হত্যা করা বৈধ মনে করা মারাত্মক বিভ্রান্তি।

ইসলামী আইনে কোন মুসলিমকে কোনো কারণে কাফির বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ যদি না সেই ব্যক্তি ইসলামের কোন মৌলিক বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। বিচারের মাধ্যমে হত্যাযোগ্য অপরাধীকে এবং যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো কাফিরকে হত্যা করাও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। যুদ্ধ ঘোষণা ও বিচার ব্যবস্থাকে একান্তভাবেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। যেন কেউ কখনো ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দিতে বা হত্যা করতে না পারে। পাশাপাশি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদার ক্ষতি করাকে হারাম ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হলো, তাহলে কিভাবে ইসলামের নামে এ সকল জানবাজ আবেগী মানুষগুলো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হলো? এর মূল কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, রসূলুল্লাহ স. এর সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণ যেখানে দীন প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের গুরুত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি রক্তপাত ও হত্যার ভয়াবহতা অনুধাবন করতেন এবং সকল উগ্রতা থেকে আত্মরক্ষা করতেন, সেখানে সঠিক জ্ঞানের অভাবের কারণে এ সকল আবেগী মানুষেরা জিহাদের নামে খুন, রক্তপাত, ধনসম্পদের ক্ষতি, বান্দার হক নষ্ট ইত্যাদি কঠিন অপরাধে লিপ্ত হতো।

খারিজীদের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের প্রচেষ্টা :

পরিবর্তন, জিহাদ ও উগ্রতা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আলী রা.-এর পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও অন্য কয়েকজন সাহাবী খারিজীদের সামনে তাদের মতামতের বিভ্রান্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অনেকে এই প্রচেষ্টায় সংশোধিত হলেও অন্য অনেকেই তাদের উগ্রতা পরিত্যাগ করেনি। এর মূল কারণ ছিল, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের পারঙ্গমতা সম্পর্কে তাদের অহংকার। সাহাবীগণ আজীবন রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্যে থেকে কুরআন বুঝেছেন। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা ও মতামতের বিশেষ কোনো গুরুত্ব খারিজীরা মানত না। এই মানসিকতাই ছিল সকল বিভ্রান্তির উৎস।

বস্তুত, কুরআনের বাস্তব প্রয়োগে রসূলুল্লাহ স.-এর কর্ম ও বাণীই হলো সুন্নাত (হাদীস)। আর সুন্নাতের আলোকেই কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ সাহাবীগণ এভাবে সুন্নাতের আলোকে খারিজীদের উন্মাদনা রোধের চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহে সংকলিত হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, সাহাবীগণ তাদের 'জিহাদ' কেন্দ্রিক বিভ্রান্তিগুলো অপনোদনের চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, খারিজীরা ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিরোধিতা করে। তারা যে সকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে সেগুলো আদেশ, নিষেধ, পরিবর্তন, জিহাদ, দীন প্রতিষ্ঠা ও ফিতনা দূরীকরণের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কখনোই এই কর্মকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয বলে প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা হলো, ইসলামে মুসলিমের উপর অনেক কর্ম ফরয করা হয়েছে। সকল ফরয কর্মই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেগুলোর মধ্যে কোনোটির চেয়ে কোনোটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্বের বেশিকম সাধারণভাবে সকলের জন্য হতে পারে আবার ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে হতে পারে। সর্বাবস্থায় গুরুত্বের কমবেশি আবেগ বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং 'সুন্নাতের' আলোকে বা রসূলুল্লাহ স.-এর আজীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আচরণের আলোকে বুঝতে হবে। সাহাবীগণ সুন্নাতের আলোকে তাদের এই ভুল অপনোদনের চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়ত, ফরযে আইনের চেয়ে ফরযে কিফাইয়া বা নিজের চেয়ে অপরের সংশোধনের বিষয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা। খারিজীদের কাউকে ব্যক্তিগতমত লালনে বা ব্যক্তিগত মতানুসারে ইবাদত বন্দেগী, ব্যক্তিজীবন বা পারিবারিক জীবন পালনে আলী রা. বা অন্য কোনো সাহাবী বা পরবর্তী শাসক বা আলিমগণ বাধা দেননি। রাষ্ট্র, শাসক বা জনগণের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বা আদেশ-নিষেধ করতেও কেউ তাদেরকে বাধা দেয়নি। তাত্ত্বিক বিতর্ক হলেও, তাদের কর্মে বাধা দেয়া হয়নি।[৩৫] কিন্তু এতে তারা পরিতৃপ্ত থাকেনি। তাদের একমাত্র লক্ষ ছিল 'অন্যান্যদের জীবনে 'আল্লাহর দীন' বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করা।' এজন্য কল্পিত অপরাধে অপরাধী বা সত্যিকার অপরাধে অপরাধী শাসক, প্রশাসক ও জনগণকে সংশোধন ও ফিতনা দূর করে দীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে তারা নিজেরা পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছিল। তাদের মানসিকতা ছিল, সমাজের অন্য মানুষের জীবনে 'দীন' প্রতিষ্ঠা না হলে বোধ হয় আমার নিজের দীন পালন মূল্যহীন হয়ে গেল। সাহাবীগণ

সুন্নাতের আলোকে তাদের এই বিভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা করেন। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

তাবিয়ী নাফে র. বলেন, এক ব্যক্তি (খারিজী নেতা নাফে ইবনুল আযরাক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের রা. নিকট এসে বললো, 'হে আব্দুর রহমান! কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন? আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ভাতিজা! ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচটি বিষয়ের উপর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের স. উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও রমযানের সিয়াম আদায় এবং যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ। সে বললো, হে আবূ আব্দুর রহমান! আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেন, 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তোমরা জুলুমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহ নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (তিনি আরো বলেছেন): 'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।'৩৬ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা তো রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে বিপদগ্রস্ত হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকলো না।'৩৭

এখানে ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি।

প্রথমত, শুধু ফযীলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কুরআন কারীম ও রসূলুল্লাহ স.-এর সামগ্রিক শিক্ষার আলোকেই তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমে সালাত, সিয়াম, যাকাত, জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অনেক ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি ব্যক্তিগত এবং কোনটি সমষ্টিগত, কোনটি সকলের জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয়, কোনটি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। এ সকল কুরআনী নির্দেশ যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর বাস্তব জীবন ও বাণী থেকেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানা যায়।

রসূলুল্লাহ স.-এর বাস্তব জীবনের শিক্ষা ও কর্ম থেকে জানা যায় যে, কুরআনে উল্লিখিত সকল নির্দেশের মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটি কর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোর উপরেই দীনের ভিত্তি। জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেগুলোর পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার আলোকে যে ছাড় বা সুযোগ আছে তা আরকানে ইসলামের ক্ষেত্রে নেই। তাঁরা বুঝতেন যে, জিহাদ আরকানে ইসলামের মত ব্যক্তিগত ফরয

ইবাদত নয় যে, তা পরিত্যাগ করলে গুনাহ হবে। বরং বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র আরকানে ইসলাম পালনকারীকে পূর্ণ মুসলিম ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮] অন্যান্য হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ পরিত্যাগকারী পঞ্চ আরকান পালনকারী মুমিনেরও প্রশংসা করা হয়েছে।[৩৯] অনেক হাদীসে বিশৃঙ্খলা, ফিতনা বা হানাহানির সময়ে, আদেশ, নিষেধ, দাওয়াত ও জিহাদ পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[৪০] অন্যত্র পিতামাতার খেদমত বা আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪১]

বস্তুত, রাষ্ট্র, সমাজ ও অন্য মানুষের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠাকে নিজের ব্যক্তি জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার মত একই পর্যায়ের ইবাদত বলে মনে করা, অথবা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উগ্রতার কারণ। এই উগ্রতা বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে। যেমন অন্যান্য মুমিনের বা রাষ্ট্রের অন্যায় দূর করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে কাফির বলা, সমাজের মানুষদেরকে ঘৃণা করা, জোর করে মানুষদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা, নিজের জীবনে ইবাদত বা তাহাজ্জুদ, যিকর, ক্রন্দন ইত্যাদিতে অবহেলা করা।

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া সকল দেশের সকল সমাজের মানুষের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে ইসলামে। মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশ ও সমাজে বসবাস করে একজন মুসলিম তার ধর্ম পালন করতে পারেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তার ধর্ম পালনের জন্য শর্ত বা মূল স্তম্ভ বলে গণ্য করা হয়নি। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অংশ। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান আছে। তবে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম নয়। মুমিন ব্যক্তি আরকানে ইসলামসহ অন্যান্য ফরয, নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে নিজের জীবনে পূর্ণতমভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে সুযোগ ও সাধ্যমত কুরআন নির্দেশিত উত্তম আচরণ দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ' উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। তবে এই চেষ্টা সফল না হলে মুমিনের দীন পালন ব্যাহত হয় বা সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপের কারণে মুমিন ব্যক্তি পাপী হন এরূপ চিন্তা বিভ্রান্তিকর। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[৪২]

কাজেই পরিবর্তনের আগ্রহে কোনো মানুষের জান, মাল, সম্মান ইত্যাদির ক্ষতি করা বা অন্য কোনো ইসলাম নিষিদ্ধ পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়া চরম বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।

ইবনে উমর রা. নিজেও কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তবে জিহাদের অনেক শর্ত রয়েছে। সেগুলোর অন্যতম হলো জিহাদ শুধু যুদ্ধরত কাফিরের

বিরুদ্ধেই হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মুসলিম বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদিও বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু ইবনে উমর রা. ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবী এক্ষেত্রে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন।

তৃতীয়ত, ফিতনা দূরীকরণ ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তারা মুসলিমের দীন পালনের নিরাপত্তাটিই মূল বলে মনে করেছেন। মুসলিম যতক্ষণ দীন পালনের নিরাপত্তা ভোগ করেছে ততক্ষণ ফিতনা দূরীভূত করার নামে যুদ্ধ করার সুযোগ নেই। বরং দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ, ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

(২) যে সকল সাহাবী খারিজীদের বুঝাতে চেষ্টা করেন তাঁদের একজন জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ রা.। একবার তিনি খারিজীদের কতিপয় নেতাকে ডেকে বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাঠিন্যের পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্যের পথ অবলম্বন করেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই যদি কেউ পারে এইরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করতে তবে সে যেন করে।' এ কথা শুনে উপস্থিত লোকগুলো খুব ক্রন্দন করতে লাগল। তখন জুনদুব রা. বলেন, এরা যদি সত্যবাদী হয় তবে এরা মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু পরে আবার তারা উগ্রতার পথে ফিরে যায়।[৪৩]

এখানে জুনদুব রা. দু'টি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রথমত, উগ্রতার। উগ্রতার দু'টি দিক রয়েছে। এক. নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দীন পালনের জন্য নফল-মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ে অতি কষ্টদায়ক রীতি অনুসরণ করা। দুই. অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনকে নিজের অন্যতম বোঝা বলে গ্রহণ করা এবং সেজন্য উগ্র পন্থা অবলম্বন করা। দু'টি বিষয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী যা মুমিনের জীবনে দীন পালনকে কঠিন করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, তিনি সুন্নাতের আলোকে জিহাদ বনাম হত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন এবং জিহাদের নামে রক্তপাতের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(৩) ৬০ হিজরীতে মু'আবিয়ার রা. মৃত্যুর পরে তার পুত্র ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মক্কা, মদীনা ও কূফার অধিকাংশ মানুষ তার খিলাফতের বিরুদ্ধে ছিলেন। মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ইয়াযিদের খিলাফত অস্বীকার করেন এবং এক পর্যায়ে নিজে খিলাফতের দাবি করেন। ৬৪ হিজরীতে ইয়াযিদের মৃত্যুর পরে ইবনু যুবাইর মক্কায় খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অপরদিকে সিরিয়ায় ইয়াযিদের পুত্র মু'আবিয়াকে খলীফা ঘোষণা করা হয়। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা ইবনু যুবাইরকেই খলীফা হিসেবে গ্রহণ করে। একপর্যায়ে সিরিয়ার কিছু এলাকা ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইবনু যুবাইরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংঘাত চলতে থাকে। একপর্যায়ে ৭৩ হিজরীতে উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনীর হাতে ইবনু যুবাইর পরাজিত ও নিহত হন।

এই দীর্ঘ প্রায় ১০ বছরের সংঘাতের সময়ে অধিকাংশ মুসলিম ইবনু যুবাইরের শাসনকেই ইসলামী শাসন ও ন্যায়বিচারের পক্ষে মনে করেছেন। ইয়াযিদ ও তার বংশকে তারা ইসলামী শাসনের

বিরোধী বলে গণ্য করেছেন। তবে তৎকালীন জীবিত সাহাবীগণ সরাসরি সংঘাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন তার প্রাণ, সম্পদ বা মর্যাদার কোনোরূপ ক্ষতি করা ইসলামে কঠিনভাবে হারাম। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, তারা মনে করতেন, যারা সংঘাতে লিপ্ত তারা তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মের আলোকে ভাল বা মন্দ বলে গণ্য হবেন। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া জরুরী নয়। কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। পক্ষান্তরে খারিজীগণ এবং তাদের মত আবেগীগণ মনে করত, এই সংঘাতের মধ্যেই 'ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কাজেই 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার' এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছু মানুষ হত্যা করা কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষত যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়েছে তাদেরকে কাফির ঘোষণা করে হত্যা করতে অসুবিধা কী?

৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকেন, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর নিকট এসে বলে, 'মানুষেরা ফিতনা-ফাসাদে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আপনি ইবনু উমর, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, কারণ আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তারা বলে, আল্লাহ কি বলেননি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।'[৪৪]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. প্রথমত, জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করেছেন। ইসলামের মূলনীতি হলো, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[৪৫] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বারংবার জিহাদের আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কর্ম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, তিনি 'জিহাদ' ও 'ফিতনা'র মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, সাহাবীগণ যে জিহাদ করেছিলেন তা ছিল ফিতনা রোধ করতে। আর খারিজীগণ যে জিহাদ করছে তা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও ফিতনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, জিহাদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ এবং ফিতনা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরিচালিত যুদ্ধ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই জিহাদ পরিচালিত হবে। খারিজীগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পর্যায়ে নিয়ে এসে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। বস্তুত, হত্যা, বিচার, শক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে

তা ফিতনার মহাদ্বার উন্মোচন করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অপরাধী। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী বিচার, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগ করতে থাকে তবে তার চেয়ে বড় ফিতনা আর কিছুই হতে পারে না।

(৪) তাবিয়ী সাফওয়ান ইবনু মুহরিয বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের ফিতনার সময়ে সাহাবী জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী রা. এ সকল সংঘাতের বিষয়ে আগ্রহী কতিপয় ব্যক্তিকে ডেকে একত্র করে তাদেরকে সর্বাবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠকারী ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতি থেকে সাবধান করার জন্য বলেন, রসূলুল্লাহ স. কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে এক কাফির সৈনিক দুর্দমনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে উসামা ইবনু যায়েদ রা. উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমণ করেন। তিনি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। উসামা সেই অবস্থাতেই তাকে হত্যা করেন। রসূলুল্লাহ স. তা জানতে পেরে উসামাকে বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? তিনি বলেন, সে মুসলিম বাহিনীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, অমুক অমুককে হত্যা করেছে। সে তরবারির ভয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন! কিয়ামতের দিন যখন এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? এভাবে তিনি বারবারই বলতে লাগলেন।[৪৬] এখানেও জুনদুব রা. ঈমানদার ব্যক্তিকে কাফির বলা ও তাকে হত্যা করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে এদেরকে সাবধান করেছেন।

(৫) উসামা বিন যায়েদ রা. স্বয়ং এই ঘটনা বর্ণনা করে এরূপ আবেগী যুবকদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন এভাবে বারংবার ব্যাকুল চিত্তে আফসোস করতে লাগলেন, তখন আমি কামনা করতে লাগলাম যে, হায় যদি আমি আজই মুসলমান হতাম। তখন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেন, আমি কখনো কোনো মুসলিমকে হত্যা করব না। তখন উপস্থিত একজন বলল, কেন আল্লাহ বলেননি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'। সা'দ বলেন, আমরা তো যুদ্ধ করেছিলাম ফিতনা দূরীভূত করতে, আর তুমি এবং তোমার সাথীরা যুদ্ধ করতে চাও ফিতনা সৃষ্টি করতে।[৪৭]

মুসলিমকে কাফির বলা

খারিজীদের সাথে সাহাবীগণের উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, তারা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, কখনো কোনো মতবিরোধ, পাপ বা অপরাধের কারণে মুমিন ভাই তার ভ্রাতৃত্ব হারায় না। কাজেই যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে তাকে মুমিন বলেই গণ্য করতে হবে। 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।' এই আয়াত ও অনুরূপ আয়াত ও হাদীসের আলোকে খারিজীরা মুসলিমকে কাফির বলতে থাকে, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. তাদেরকে বলেন, 'এখানে কুফর বলতে তোমরা যা বুঝেছ তা নয়। এই পর্যায়ের

কুফর মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির' এখানে কুফরের নিচেও কুফরী আছে।'[৪৮]
বস্তুত কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও রসূলুল্লাহ স.-এর সারাজীবনের শিক্ষার আলোকে তাঁরা এ মত প্রকাশ করেছেন। কুরআনের কিছু আয়াত বা কিছু হাদীসের আলোকে পাপীকে কাফির বলা হলে কুরআনের অন্যান্য অনেক আয়াত ও রসূলুল্লাহ স.-এর আজীবনের শিক্ষা এবং পাপী মুসলিমদের সাথে তাঁর সারাজীবনের আচরণ বাতিল করতে হয়। সাহাবীগণের আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে আমরা খারিজীদের এই ভয়ংকর মতবাদটি পর্যালোচনা করব।

পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা

ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ সততা ও পাপমুক্ত জীবন যাপনে উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু মুসলিম বলে গণ্য হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ পাপমুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করেনি। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা না করাকে কুরআনে কুফর বলা হয়েছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসে অনেক পাপকে কুফর বলা হয়েছে। এগুলোর উপর নির্ভর করে খারিজীরা দাবি করে যে, আল্লাহর বিধান অমান্য করে যে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহর বিধানের বাইরে ফয়সালা দেয়া। কাজেই সকল পাপীই কাফির।
তাদের এই মত কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে 'কুফর' বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করে না তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আর আল্লাহর অন্যতম বিধান হলো, এক মুমিন অন্য মুমিনকে হত্যা করবে না, বা পরস্পর যুদ্ধ করবে না। মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন: 'আল্লাহ যে জীবনকে মহাসম্মানিত-নিষিদ্ধ করেছেন সেই জীবনকে তোমরা ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া হত্যা করবে না।'[৪৯] রসূলুল্লাহ স. স্পষ্টতই মুমিনের সাথে যুদ্ধ করাকে 'কুফর' বলেছেন। তিনি বলেন, 'মুসলিমকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করাকে 'কুফর'।[৫০]
অথচ আমরা দেখছি যে, আল্লাহর এই বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিয়ে মুমিনের সাথে যুদ্ধরত ব্যক্তি, হাদীসের ভাষায় যে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত, তাকে কুরআন কারীমে 'মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত আয়াতে পরস্পর যুদ্ধরত 'মুসলমানদেরকে মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং পরের আয়াতে যুদ্ধরত মুমিনদেরকে অন্য মুমিনদের ভাই বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
অগণিত হাদীসে পাপীকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন, কুরআন কারীমে ব্যবহৃত কুফর, নিফাক ও জুলুম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে এবং কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা, মুনাফিকের গুণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্যান্য মানুষের সমালোচনায় বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা এবং সমাজের সকল মানুষকে পাপী, কাফির, ধ্বংসপ্রাপ্ত ইত্যাদি বলা মূলত নিজের ধার্মিকতা ও জ্ঞানের অহঙ্কার থেকেই উৎসারিত। রসূলুল্লাহ স. এরূপ মানসকিতা পরিহার করতে কঠোর তাগীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যখন কেউ বলবে যে লোকজন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সে ব্যক্তি নিজেকেই ধ্বংস করলো।'[৫১]

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা সামাজিক অশান্তির প্রথম পদক্ষেপ। রসূলুল্লাহ স. এ বিষয়ে তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন ও সতর্কতা অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা তাদের দু'জনের একজনের উপর বর্তাবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির হয় তবে তো ঠিক অন্যথায় কাফির আখ্যায়িতকারীর উপরই কুফর প্রযোজ্য হবে।'[৫২]

'যদি কেউ তার ভাইকে বলে, হে কাফির, তবে তাদের দু'জনের একজনের উপর এই কুফরের দায়ভার বর্তাবে।'[৫৩]

'যদি কেউ কোনো মানুষকে কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট করে আহ্বান করে অথবা তাকে বলে, 'হে আল্লাহর শত্রু' আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তার উপরই বর্তাবে।'[৫৪]

'যে কোনো ব্যক্তি অপরকে কাফির বলে গণ্য করল তাদের দু'জনের একজনের উপর তা বর্তাবে। যদি সে কাফির হয় তবে তা ঠিক অন্যথায় তাকে কাফির ঘোষণা করার কারণে কাফির ঘোষণাকারীই কাফির হয়ে যাবে।'[৫৫]

'যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ।'[৫৬]

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে এবং কুরআন-হাদীসের সকল বক্তব্যের সামগ্রিক ও সমন্বিত অর্থের উপর নির্ভর করে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম উম্মাহর মূলধারার মুসলিমগণ ঈমানের দাবিদার কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মূলনীতি হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। এবং সকল কুফর, শিরক, পাপ, অন্যায়, অবাধ্যতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে তার বাহ্যিক আচরণের উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিককে মুসলিম মনে করা অনেক নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই।

এই নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে কাফির বা ধর্মত্যাগী বলা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন অথবা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাস পোষণ করার

ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে ধর্মত্যাগী গণ্য করা যাবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন, বা ইসলামের কিছু অলংঘনীয় বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে দাবি করেন তবে তা কুফর বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী বলে মনে হলেও তার কোনোরূপ ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণের অবকাশ থাকলে তদনুযায়ী তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওযর বা অজ্ঞতা আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওযরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে এ হলো ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।[৫৭]

এই মূলনীতির প্রতি সাহাবীগণের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তাঁরা কখনো খারিজীদেরকে কাফির বলেননি। খারিজীরা তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী রা. বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেননি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন, এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের রায় ব্যতীত কখনো এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেননি।[৫৮]

রাজনৈতিক কারণে কাফির বলা

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খারিজীদের কাফির কথনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। কুরআন-হাদীস নির্দেশিত সুস্পষ্ট পাপে লিপ্ত তাদের দলভুক্ত ব্যক্তিদেরকে তারা মুমিন বলে গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে তারা রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে কল্পিত পাপ বা 'আল্লাহর আইন অমান্য' করার অপরাধে কাফির বলে গণ্য করেছে। আমরা দেখেছি যে, আলী রা. ও তাঁর অনুসারীদেরকে তারা কল্পিত পাপের অপরাধে কাফির বলেছে। এছাড়া উমর ইবনু আব্দুল আযীয র. ছাড়া অন্যান্য উমাইয়া শাসককেও তারা কাফির বলে গণ্য করে। কারণ তারা শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের আল্লাহর নির্দেশ পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে বংশতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। উমর ইবনু আব্দুল আযীযকে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারী, সৎ ও ন্যায়বিচারক হিসেবে মানলেও, তিনি যেহেতু পূর্ববর্তী শাসকদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করেন, সেহেতু তারা তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ অব্যাহত রাখে।[৫৯]

এক্ষেত্রে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণ পূর্ববর্তী মূলনীতির অনুসরণ করেন। তাঁরা বলেন, কুরআন কারীমে আল্লাহর বিধান মত ফয়সালা না করাকে কুফর বলা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামী বিধানানুসারে বিচার করা অপ্রয়োজনীয় অথবা ইসলামী আইনকে অচল বা বাতিল মনে করেন তবে তিনি নিঃসন্দেহে কাফির বা অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি ইসলামের নির্দেশকে সঠিক জেনেও জাগতিক লোভ, স্বার্থ, ভয় ইত্যাদি কারণে ইসলাম বিরোধী ফয়সালা দেন তবে তার এই কার্যক্রম মারাত্মক পাপ বলে গণ্য হবে।[৬০]

যেমন মাদকদ্রব্য ইসলামে হারাম এবং কারো মদপান প্রমাণিত হলে বেত্রাঘাতের বিধান দেয়া হয়েছে। কেউ যদি মদ বৈধ মনে করেন অথবা মদপানের জন্য শাস্তি প্রদানকে সেকেলে, আপত্তিকর বা অমানবিক মনে করেন তবে তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে যদি কোনো বিচারক মদের অবৈধতা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং মদপানের জন্য শাস্তি দেয়াই সঠিক বলে মনে করেন, দল বা সেনাবাহিনীকে অনুগত রাখার লোভে, শাসক বা আমীরের চাপে, জাগতিক কোনো স্বার্থে বা পক্ষপাতিত্বের কারণে আইন প্রয়োগ না করেন বা অপরাধীকে শাস্তি না দেন তবে তিনি পাপী গণ্য হবেন, আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবেন, কিন্তু অবিশ্বাসী কাফির গণ্য হবেন না। বিশেষত যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করেছেন, তিনি 'আল্লাহর আইন' অমান্য করলে বা 'আল্লাহর আইনের বাইরে ফয়সালা দিলে' তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা তার কুফরী প্রমাণিত হয়।

সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে খারিজীদেরকে এ বিষয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন। যখন তারা কুরআনের বাণী 'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান বা শাসন নেই' এই আয়াতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বা শাসকের দায়িত্ব ও অধিকার অস্বীকার করে তখন তাদের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আলী রা. বলেন, 'তারা একটি সঠিক কথাকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করছে। তারা বলছে 'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই বা কর্তৃত্ব নেই।' কিন্তু তারা বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো শাসন নেই। কিন্তু মানুষের জন্য তো একজন শাসক প্রয়োজন। তার শাসনাধীনে মুমিন কর্ম করবে এবং পাপীও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এভাবেই আল্লাহর নির্ধারিত সময় পূর্ণ হবে। যিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, জনগণের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং সবল থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করবেন। এভাবে সৎ মানুষেরা শান্তি পাবে এবং অপরাধীরা দমিত হবে।'[৬১]

এখানেও রসূলুল্লাহ স.-এর প্রায়োগিক সুন্নাতের আলোকে আলী রা. আল্লাহর বিধান পালনে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। ইসলামের অনেক নির্দেশনা সকল মুমিন ব্যক্তিগতভাবে পালন করেন। আবার অনেক নির্দেশনা পালন করবে রাষ্ট্র। সেগুলোর অন্যতম হলো বিচার, শাসন, নাগকিরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। বিচার, শাসন, যুদ্ধ ইত্যাদি ইবাদত কখনোই কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে পালন করতে পারেন না।

কুরআন কারীমে বারংবার কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ কিতাল বা যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন স্থানে কাফির-মুশরিকদের হত্যার নির্দেশ বা অনুমতি দেয়া হয়েছে এ থেকে খারিজীগণ ধারণা করে যে, কাফির হলেই হত্যা করা যাবে। তাদের এই ধারণা ছিল 'সুন্নাত' বা রসূলুল্লাহ স.-এর প্রয়োগের উপর নির্ভর না করে মনগড়াভাবে কুরআনের অর্থ করার ফল। কুরআনের নির্দেশাবলি সকল আয়াতের সমন্বয়ে ও রসূলুল্লাহ স.-এর প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝতে হবে।

অন্যায়ের পরিবর্তন

মুসলমানদেরকে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ও দুষ্কর্মের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কখনো তাকে আইন হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি কোন দুষ্কর্ম সংঘটিত হতে দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।'[৬২]

কাউকে কোনো অপরাধে লিপ্ত দেখে তাকে বিচারকের নিকট সোপর্দ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কেউ শাস্তি দিতে পারেন না। এই প্রক্রিয়ার বাইরে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। উমর রা. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রা.-কে বলেন, আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কী? আব্দুর রহমান রা. বলেন, আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান। উমর রা. বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।[৬৩] অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানও নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষ্যেরও অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের একার সাক্ষ্যে কোনো বিচার হবে না। বিধিমোতাবেক দুইজন বা চারজন সাক্ষীর কমে বিচারক কারো বিচার করতে পারবেন না।

উমর রা. রাতে মদীনায় ঘোরাফেরা করার সময় এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী রা. বলেন, কখনোই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[৬৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা পরিবর্তন মুমিনের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে বিচার বা শাস্তি নিজের হাতে তুলে নেয়ার অর্থ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও রাষ্ট্রের আনুগত্য পরিত্যাগ করা। খারিজীগণ এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য না বুঝে অন্যায়ের পরিবর্তনের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়। খারিজীগণ হুযাইফা রা.-কে বলে, আমরা কি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে পারবো না? আপনি কি তা করবেন না? তিনি উত্তরে বলেন,

'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। তবে তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা বিদ্রোহ করা সুন্নাত সম্মত নয়।'[৬৫]

খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন করা হয়েছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, আমানত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইনদাতা মনে করেছেন এবং কুরআনী বিধিবিধান ও আইনকে অবহেলা করেছেন। এমনকি সালাতের সময় ও পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়েছে। উমাইয়া শাসনামলে সাহাবীগণ এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কখনোই তারা এ কারণে 'রাষ্ট্র' বা সরকারকে জাহিলী, কাফির বা অনৈসলামিক বলে গণ্য করেননি। বরং তাঁরা সাধ্যমত এদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপনসহ এদের আনুগত্য বহাল রেখেছেন। এদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং এদের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালেও কোনো মুসলিম ইমাম, ফকীহ বা আলিম এ কারণে এ সকল রাষ্ট্রকে 'দারুল হরব', 'অনৈসলামিক রাষ্ট্র' বা 'জাহিলী রাষ্ট্র' বলে মনে করেননি। তারা তাদের সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন, সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রেখেছেন।[৬৬] পাশাপাশি তাঁরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ দিতেন এবং 'নাহি আনিল মুনকার' অন্যায় কাজে নিষেধের নামে অস্ত্রধারণ, শক্তিপ্রয়োগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতার উস্কানি দিতে নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত নির্দেশনা হাদীসগ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।[৬৭]

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায়ের পরিবর্তনের প্রবল স্নায়বিক চাপ দ্রুত ফল অর্জনের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদি কারণে উগ্র ও আবেগী হয়ে যারা সহিংসতা বা হঠকারিতার পথ বেছে নিয়েছে তারা কখনো ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেনি। খারিজীগণ ও অন্যান্য উগ্র জনগোষ্ঠী তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছে এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছে। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা সৃষ্টি করা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অনুসারী আলেমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা ও শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর সলা পরামর্শ দিয়ে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করার চেষ্টা করে আসছেন।

৪. উপসংহার

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং ইসলামের মূল দর্শন অনুধাবন না করতে পারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থার জন্ম দিতে পারে। সন্ত্রাস রোধের

জন্য ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রসার অতীব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সন্ত্রাসী কর্মের প্রতিরোধে সাহাবায়ে কিরামগণ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কর্মপন্থা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসের উৎস হলো, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, মুসলিম সমাজের প্রতি ঢালাও অনাস্থা, ঘৃণা, জ্ঞানের অহঙ্কার, ধার্মিকতার অহঙ্কার, ব্যক্তি বা দল বিশেষের জন্য ইসলামের ব্যাখ্যা দানের বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার ইত্যাদি দাবি করা। আর সন্ত্রাসের প্রকাশ হলো, ঈমানের দাবিদারকে তার কর্মের কারণে কাফির বলে দাবি করা, কাফির হত্যা বৈধ বলে দাবি করা, বিচার বা জিহাদের নামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হওয়া। কাজেই এগুলো সম্পর্কে মুসলিমদের সচেতন হতে হবে। অন্যথায় কোনো ব্যক্তি বা দলের উচ্চাভিলাষের শিকার হয়ে, অথবা ইসলামের শত্রুদের খপ্পরে পড়ে, অথবা অন্যায়ের প্রতিকারের আগ্রহ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনায় অনেক তরুণ ধার্মিক যুবক সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়তে পারে।

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীগণের মত ও পথের উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন।

•

তথ্যসূত্র

১. শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান, কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৪৬২।

২. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 5th edition, 1995, page 738.

৩. Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & article: Zealot.

৪. Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & Ideology.

৫. সূরা হুজুরাত, ৯ আয়াত।

৬. সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসুফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

৭. সূরা মাইদা, ৪৪ আয়াত।

৮. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ ১৯৯১) ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, মারকাযুল মালিক ফয়সাল, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭-৪৮।

৯. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) ৫/৩৮০-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ৫৯। বাগদাদ ও ওয়াসিত-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের তিনটি গ্রামের সমন্বয়।

১০. বিস্তারিত দেখুন, মুবাররদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, আল-কামিল (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)।

১১. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী, তালবীসু ইবলীস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪), পৃ. ৮৩-৮৪।

১২. আল-আজুররী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন, আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২), পৃ. ৩৭।
১৩. ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।
১৪. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি), আল-মুসনাদ (কায়রো, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮) ৫/১১০; ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।
১৫. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।
১৬. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৮৪-৮৫।
১৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি.), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) ৪/১৯২৮, ৬/২৫৪০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আস-সহীহ (কায়রো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) ২/৭৪৩।
১৮. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৯৩-৪১১।
১৯. বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৯, ১৩২১, ৪/১৫৮১, ১৭১৪, ৫/২২৮১, ৬/২৫৪০, ২৭০২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪১-৭৪৪।
২০. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৪০৫।
২১. বুখারী, আস-সহীহ, ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪৬; তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী) ৪/৪৮১; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬১।
২২. মুবাররদ, আল-কামিল ৩/১১২০।
২৩. মুবাররদ, আল-কামিল ৩/১০৮৫।
২৪. ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি.), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর) ২/১৪৯।
২৫. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৮১-৮৭।
২৬. মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৪৪-১৪৪৬; হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি.), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০) ২/৪০৪, ৪৪০, ৪৪৫, ৪/৬১৭; ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি.), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফ, ১৩৭৯ হি.) ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬।
২৭. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি.), মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১) ১৩/৪৮, ৪৯, ১৯/৭২।
২৮. সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন আব্দুর রাহমান (৯১১ হি.), মিফতাহুল জান্নাত (মদীনা মুনাওয়ারা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৫৯।
২৯. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪৭০ হি) ১/৬২; ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬ হি.), আল-আহকাম (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি.) ২/২৫৭।
৩০. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি.), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ), পৃ. ৭২-৭৪; ইবনু আবিল ইয্য (৭৯২ হি.), শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮), পৃ. ৩১৬-৩২৫; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬৩-৬৫; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ২০, ৪২।

৩১. বাগদাদী, আল-ফারুক, পৃ. ৭২-৭৩; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬৩-৮১।
৩২. ইবনু তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া ১৯/৭৩।
৩৩. ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬১-৬৩।
৩৪. Encyclopaedia Birtannica, Articles: Islam-Khawarij.
৩৫. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি.) তারীখ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.) ৩/১১৪।
৩৬. সূরা বাকারা ১৯৩ আয়াত।
৩৭. বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।
৩৮. বুখারী. আস-সহীহ ১/২৫, ২৭, ২/৫০৬, ৯৫১, ৪/১৭৯৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯-৪৪।
৩৯. মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫০৩।
৪০. হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩১৫; ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ আল-বুসতি (৩৫৪ হি.) আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩) ২/১০৮; তিরমিযী ৫/২৫৭; আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ৪/১২৪; দানী, আবূ আমর উসমান ইবনু সাঈদ (৪৪৪ হি.), আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান (রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি.) ২/৩৬৩-৩৭০; মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল বাকী (৬৫৬ হি.), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৭১ হি.) ৩/২৯৫-২৯৯; ইবনু রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.) জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩২৩-৩২৪।
৪১. বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪, ৫/২২২৮, মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫; মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/২১৫-২১৮।
৪২. সূরা ৬: মায়িদা, আয়াত ১০৫।
৪৩. বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬১৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/১২৯-১৩০।
৪৪. বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।
৪৫. বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৩০।
৪৬. মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৬-৯৭; নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ২/১০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১২/১৯৬, ২০১।
৪৭. মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৬-৯৭; নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ২/৯৯-১০৪।
৪৮. হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৩৪২। বায়হাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪) ৮/২০।
৪৯. সূরা আন'আম, ১৫১, ইসরা (বনী ইসরাঈল), ৩৩ আয়াত, ফুরকান, ৬৮ আয়াত।
৫০. বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৫/২২৪৭, ৬/২৫৯২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮১।
৫১. মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০২৪।
৫২. বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৩-২২৬৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৯।
৫৩. বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৪।
৫৪. মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৯।
৫৫. ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১/৪৮৩।
৫৬. বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৪৭, ২২৬৪।
৫৭. আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০ হি.), আল-ফিকহুল আকবার, মুল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ. ১১৭; আবু জাফর তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি.) আল-

আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইয্য হানাফীর শারহ সহ. (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮) ৩১৬।

৫৮. তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৭৪, ১৪৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬।

৫৯. ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬০, ৬৩।

৬০. তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৩৪২; তাবারী, মুহাম্মদ বিন জারীর (৩১০ হি.) জামেউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮) ৬/২৫৬; কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ (৬৭১ হি.) আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন (বৈরুত, দার আল-ফিকর, তা.বি.) ৬/১৯০; ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কায়রো, দার আল-হাদীস, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০) ২/৬২-৬৫; ইবনু আবিল ইযয, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যা, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

৬১. ইবনু আবিল হাদীদ, আব্দুল হামীদ (৫৮৬ হি.) শারহু নাহজিল বালাগাহ (কায়রো, দারু এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৬৭) ২/২১।

৬২. মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

৬৩. বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬২২।

৬৪. আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাকার সালিহী (৮৫৬ হি.) আল-কানযুল আকবার (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭) ১/২২৭।

৬৫. ইবনু আবী শাইবা, আবূ বাকার (২৩৫ হি.) আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৭/৫০৮; বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.), শু'আবুল ঈমান, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০) ৬/৬৩; দানী, আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ২/৩৯১।

৬৬. বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৩৪, ২৬৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩৭৯-৩৮৮।

৬৭. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/৫০৮; দানী, আস-সুনানুল ওয়ারিদাহ ২/৩৮৮-৪০৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ৩৭-৫২

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আব্দুল আযীয আমের

। আট ।

যে নিহত ব্যক্তি পরিপূর্ণ নির্দোষ নয় তাকে হত্যাকারীর শাস্তি

কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা নিহত ব্যক্তি যদি আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্দোষ না হয় তাহলে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস নেয়া যাবে না। যেমন কোন দেশের মুসলিম নাগরিক কিংবা অমুসলিম নাগরিক কোন বিদ্রোহী কাফের কিংবা ইসলাম ধর্মত্যাগী মুরতাদকে যদি হত্যা করে ফেলে অথবা কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক যদি কোন দেশদ্রোহীকে হত্যা করে।[১] যেহেতু এসব নিহত ব্যক্তি নির্দোষ নয় তাই এদের হত্যার বিপরীতে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাসের বিধান কার্যকর হবে না। অনুরূপ কোন দেশদ্রোহী ব্যক্তি যদি কোন দেশপ্রেমিক নাগরিককে হত্যা করে তবে বিদ্রোহী নাগরিকের বিরুদ্ধেও কিসাসের বিধান কার্যকর করা যাবে না। কারণ দেশদ্রোহীর দৃষ্টিতে দেশপ্রেমিক নাগরিক নির্দোষ ব্যক্তি নয়। যদিও দেশদ্রোহীর দেশদ্রোহিতা অযৌক্তিক, তার যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিহীন কিন্তু দেশদ্রোহী যদি প্রভাবশালী (Powerfull) ব্যক্তি হয় , তাহলে ক্ষতিপূরণ আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তার ভিত্তিহীন যুক্তি ও ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ যুক্তির মর্যাদা দিতে হবে।[২]

ইমাম আবু হানিফা র. এবং ইমাম মুহাম্মদ র.বলেন, কোন মুসলিম নাগরিক যদি মুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী কোন পরদেশী অমুসলিমকে হত্যা করে তাহলে তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। কেননা যদিও আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্দোষ কিন্তু তার নির্দোষ হওয়াটা সীমিত সময়ের জন্য, চির দিনের জন্য তার রক্ত নির্দোষ নয় এবং সে নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রাপ্তও নয়, ফলে তার রক্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের রক্তের মর্যাদা রাখে না, যে একজনের প্রতিদান অপর জনের কাছ থেকে সমপরিমাণ নেয়া হবে। যেহেতু আশ্রয়প্রাপ্ত অমুসলিম লোকটি পুনর্বার অমুসলিম রাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রাখতো, ফলে অমুসলিম দেশে ফিরে যাওয়ার পর তার কুফরী তাকে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবে-এর সমূহ সম্ভাবনা ছিল, এমতাবস্থায় একজন সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিমের অস্তিত্বের মধ্যে মুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তাহীনতার শংকা বিদ্যমান থাকে। এই সংশয় ও সন্দেহের কারণে এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে কোন মুসলিম নাগরিকের উপর কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, এমতাবস্থায়ও হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকর হবে। কেননা অপরাধ সংঘটনের সময় নিহত ব্যক্তি নিরপরাধ ছিল, সে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করছিল। সে যেহেতু নিরাপত্তার অনুমোদন নিয়েই মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল সেহেতু সে নিরপরাধ।[৩] গ্রন্থকার বলেন, আমার কাছে আবু ইউসুফ র.-এর মতামত বেশি যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য।

ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত আছে, কোন নিরাপত্তা গ্রহণকারী যদি একজন অপরজনকে হত্যা করে তবে তাদের মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে না।[৪]

রক্তমূল্যে অসমতা

কিসাস কার্যকর হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হলো, নিহত ও হত্যাকারীর রক্ত সমমূল্যের হওয়া অর্থাৎ হত্যাকারী ও নিহতের ব্যক্তি মর্যাদা ও জীবনের মূল্য আইনের দৃষ্টিতে সমপর্যায়ের হওয়া। ফকীহগণ হত্যাকারী ও নিহতের রক্তের অসামঞ্জস্যতার চারটি উপাদান নির্ধারণ করেছেন।

ক. ইসলাম ও কুফর অর্থাৎ একজন মুসলমান অপরজন কাফের হওয়া।

খ. স্বাধীন ও পরাধীন তথা একজন আযাদ ও অপরজন গোলাম হওয়া।

গ. লিংগের তারতম্য, একজন পুরুষ অপর জনের নারী হওয়া।

ঘ. এক পক্ষে একজন বিপরীতে বহুজন হওয়া।

উল্লেক্ষিত চারটি ব্যাপারে যদি হত্যাকারী ও নিহতের মধ্যে কোন গরমিল না থাকে সমতা থাকে তাহলে সর্বসম্মত ভাবে কিসাস কার্যকর হবে। কিন্তু উল্লেখিত চারটি উপাদানের কোন একটিতে যদি ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে কি না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. কোন মুসলিম যদি কোন অমুসলিমকে হত্যা করে তবে কোন কোন ফকীহর দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় কিসাস আইনে হত্যাকারী মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম শাফেয়ী, দাউদ জাহেরী, ইমাম ছাত্তরী, ইমাম আহমদ র.। অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, এমতাবস্থায় হত্যাকারী মুসলিমকে কিসাসের আইনে হত্যা করা হবে তথা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। ইমাম আবু হানি-ফা র. ও তাঁর অনুসারী সহযোগীরা এবং ইবনে আবু লায়লা এ মতের ধারক।

ইমাম মালেক এবং লাইছ ইবনে সাদ বলেন, মুসলিম হত্যাকারীকে অমুসলিম নাগরিক হত্যার জন্যে হত্যা করা হবে না, যদি না মুসলিম নাগরিক অমুসলিম ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করে থাকে। তাদের কাছে নির্মমতার অর্থ হলো, শুইয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করা এবং যদি হত্যাকারীরা অমুসলিমের ধন সম্পদ কব্জা করার জন্যে হত্যা করে থাকে।

যারা কিসাসের আইনে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দানের বিরুদ্ধে তারা হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়েত থেকে দলীল গ্রহণ করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'কোন কাফেরের বিপরীতে মুমিনকে হত্যা করা হবে না।' এই হাদীসটি আমর ইবনে শুআইবও তার পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা র. ও তাঁর সহমত পোষণকারীগণ একটি ঘটনাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেখানে রসূল স. নিজে একজন অমুসলিম যিম্মীকে হত্যার বিপরীতে একজন মুসলমানকে কিসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। সেইসাথে রসূল স. বলেন, 'আমার ক্ষেত্রে খুবই সমীচীন আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা রক্ষা করা'। এই হাদীসটি হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, কোন মুসলিমকে কাফেরের বিপরীতে হত্যা করা হবে না বলে রসূল স.-এর কথার মধ্যে যদিও কাফের শব্দটি অনির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক, উল্লেখিত দ্বিতীয়টি দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাপকার্থক কাফের শব্দটিকে 'হরবী' কাফের তথা মুসলিম বৈরী কাফের অর্থে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ফলে চুক্তিবদ্ধ যিম্মি কাফের যে মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রাপ্ত সে এই নির্দেশের আওতামুক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া আবু হানিফা র. প্রমাণ স্বরূপ বলেন, কোন আশ্রয়প্রাপ্ত অমুসলিম তথা যিম্মির সম্পদ যদি কোন মুসলিম চুরি করে তাহলে এই চুরির অপরাধে মুসলিমের হাত কাটার প্রশ্নে সকল ফকীহগণ একমত। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। বস্তুত কিসাসের দাবি হলো, কোন যিম্মির সম্পদ যদি মুসলমানের সম্পদের মর্যাদা পায় তবে তার জীবন ও মুসলমানের জীবনের মতো মর্যাদা পাওয়টাই যৌক্তিক।

গ্রন্থকার বলেন, এক্ষেত্রে আমার কাছে ইমাম আবু হানিফা র. ও তাঁর সমমনাদের অবস্থানই সঠিক মনে হয়। কারণ যিম্মির জীবন সম্পদের যদি সুরক্ষায়ই নিশ্চিত না হবে তবে আশ্রয় চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া যিম্মিরা দারুল ইসলাম তথা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক হওয়ার সুবাদে তারাও সেই সুবিধাদি পাবে।

২. কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তবে কোন কোন ফকীহর মত হলো, নারীর বিপরীতে পুরুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না। এই মতটি জমহুরে ফুকাহার মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জমহুর বলেন, কোন নারী কর্তৃক কোন পুরুষ নিহত হলে যেভাবে নারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় অনুরূপ পুরুষকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। জমহুর বলেন, নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানুষ হিসেবে নারী আর পুরুষ সমান এবং একই মর্যাদা সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকারী।

৩. কয়েকজন মিলিতভাবে যদি একজনকে হত্যা করে দাউদ ও জাহেরী মতাবলম্বীদের মতে একজনের মৃত্যুর বিপরীতে কয়েকজনকে হত্যা করা যায় না; কেননা কুরআন কারীমে 'জীবনের মোকাবেলায় জীবন' বলা হয়েছে। জমহুরে ফুকাহা এই মতকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলেন, বহুজন কর্তৃক একজন নিহত হলেও একজনের বিপরীতে বহুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। হযরত উমর রা. এ মতের পক্ষে ছিলেন। সুনাআ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি উক্তি করেছিলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডে যদি সুনাআ'র সব অধিবাসীও জড়িত থাকতো তাহলে এই একজনের মোকাবেলায় আমি সুনাআর গোত্রের সবাইকে হত্যা করতাম।' একজনের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বহুজনকে হত্যার বিষয়টি আইনও দাবী করে। কেননা ইসলামী শরীয়ত অন্যায় হত্যাকাণ্ড রোধ করার জন্যেই কিসাসের বিধান করেছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে ঘোষণা করেছেন, 'হে বিবেকবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা, কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।' একজনের হত্যাকাণ্ডে জড়িত একাধিক

হত্যাকারীকে যদি কিসাসের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়, অথবা কিসাস রহিত করে দেয়া হয় তাহলে অপরাধীরা সংঘবদ্ধভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কিসাস থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, ফলে শরীয়ত প্রণেতা যে লক্ষে কিসাসের বিধান দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যই অকার্যকর হয়ে যাবে।[৫]

গ্রন্থকার বলেন, আমার দৃষ্টিতে জমহুরে ফুকাহার অভিমত বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ হত্যাকারী যখন একাধিক থাকে, তখন যাচাই করলে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের মধ্যে হত্যাকাঙ্ক্ষা পাওয়া যায় এবং সবার সম্মিলিত ইচ্ছার কারণেই নিহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় পৃথকভাবে প্রত্যেকের মধ্যে কিসাস প্রয়োগের শর্ত বিদ্যমান থাকে, ফলে স্বতন্ত্রভাবে বিচার্যের ক্ষেত্রে তার সাথে আরো সহযোগী ছিল এই কারণে ক্ষমা করা যায় না। কারণ একাধিক লোকের সংশ্লিষ্টতা অপরাধ সংঘটনকে আরো শক্তি যোগায়, অপরাধ কর্ম সহজ হয়, ফলে এ ধরনের ঘটনায় এমন কারোর শাস্তি দরকার যে শাস্তি হত্যাকাণ্ডের মতো সংঘবদ্ধ অপরাধ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে।

রক্তপণের ক্ষমা

কিসাসের দাবি করা নিহতের উত্তরাধিকারীদের হক। ফলে রক্ত মূল্য ক্ষমা করে দেয়ার ক্ষমতাও তাদেরই। তারা ইচ্ছা করলে রক্তপণ নিয়ে ক্ষমা করতে পারে নয়তো রক্তপণ ছাড়াও ক্ষমা করতে পারে। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, নিহতের উত্তরাধিকারীরা যদি হত্যাকারীর কিসাস ক্ষমা করে দেয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এ প্রেক্ষিতে বলেন, 'হত্যাকারীর সাথে যদি তার ভাই কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শনে সম্মত হয় তবে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা এবং সততার সাথে রক্ষপণ আদায় করা উচিত।' (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব যদি না নিহতের উত্তরাধিকারীগণ তা ক্ষমা করে দেয়।'

নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বিচারক হত্যাকারীর উপর কিসাস প্রয়োগ করতে পারেন না। কেননা ক্ষমা অবশ্যম্ভাবীরূপে কিসাস রহিত করে দেয়; এক্ষেত্রে রক্তপণের বিনিময়ে ক্ষমা করুক বা রক্তপণ ছাড়াই ক্ষমা করুক তা কিসাস মওকুফের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে হত্যাকারীকে কি কোন ধরনের শাস্তি ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে, না শাস্তি দেয়া হবে?

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের কোন অস্তিত্ব আদৌ আছে না নেই এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এমন হত্যাকাণ্ড যা ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ও ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের মাঝামাঝি এটাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড। ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেয়ী ছাড়াও আরো অনেক ফকীহ এ ধরনের হত্যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উমর, আলী, উসমান যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আবু মূসা আশআরী রা.

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের অস্তিত্বের পক্ষে। এ ব্যাপারে কোন সাহাবী তাদের বিরোধিতা করেননি। ইমাম মালিক র. সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অবশ্য পিতা কর্তৃক সন্তান নিহতের ব্যাপারটিকে তিনি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেন এবং এর পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। যারা এ প্রকার হত্যাকাণ্ডের অস্তিত্বের সমর্থক, এর সংগার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, লোহার ধারালো অস্ত্র ছাড়া লোহার বড় লাঠি, আগুন অথবা এধরনের কোন কিছু দিয়ে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে এটিই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সদৃশ। তাঁর দৃষ্টিতে এমন জিনিস যা শরীরে বিদ্ধ হয় না এবং শরীর কাটে না কিন্তু সাধারণত এসব জিনিসের আঘাতে মানুষ মারা যায় তাই ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, যে সব জিনিসের দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে না যদি এসব জিনিসের আঘাতে মৃত্যু ঘটে তাহলে সেটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সদৃশ বলা হয়। ভিন্নভাবে বলা যায়, হত্যাকাণ্ডে এমন জিনিস ব্যবহার করেছে যেগুলো দিয়ে সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে না তাহলে সেটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, আঘাত ইচ্ছাকৃত হলেও হত্যাকাণ্ডটি ভুলবশত হয়ে গেছে এমন হত্যাকে ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যাকাণ্ড বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে নিহতকে হত্যাকারীর মারধোর করার ইচ্ছা ছিল হত্যার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ভুলক্রমে মৃত্যু ঘটে গেছে। ইমাম শাফেয়ী র.-এর দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যা সেটিকে বলা হবে যাতে কর্মের পরিণতি ও ইচ্ছা উভয়টিতে কর্তার একই আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর ভুল হত্যাকাণ্ড সেটিকে বলা হয় যাতে কর্ম ও পরিণতি উভয়টির কোনটিতেই হত্যার ইচ্ছা না থাকে।

দৃশ্যত তাই বোঝা যায়, হত্যাকাণ্ডে যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এর ভিত্তিতেই হবে ফয়সালা। সেই সাথে যে পরিস্থিতিতে মৃত্যু ঘটেছে এর উপরও ফয়সালা নির্ভর করবে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা হত্যাকাণ্ডের পর্যায় নির্ধারণে ব্যবহৃত অস্ত্রকে মূল উপাদান নির্ধারণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী র. হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর ইচ্ছার ভিত্তিতে ফয়সালা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি হত্যাকাণ্ডের পর্যায় নির্ধারণও হত্যাকারীর নিয়তের ভিত্তিতে হবে বলে মনে করেন।

এতো গেলো সংগার ব্যাপারে মতভিন্নতা। যেসব দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে ফকীহগণ হত্যার এই পর্যায় নির্ধারণ করেছেন এখন সেগুলোর আলোচনা করা যায়। যারা হত্যার এই প্রকারভেদ অস্বীকার করেন, তাদের দলিল হলো, হয় হত্যাকারীর হত্যার ইচ্ছা ছিল নয়তো ছিল না। যদি হত্যার ইচ্ছায় আঘাত করে থাকে তাহলে সেটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড আর যদি ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে সেটি ভুলবশত হত্যাকাণ্ড। এই দুটির মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের আদৌ কোন অবকাশ নেই। যারা এটা স্বীকার করেন, তাদের কথা হলো, হত্যাকারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। একজন বিচারক বাহ্যিক বিষয়াবলী পর্যালোচনা করে বিচার করেন। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অস্ত্র ব্যবহার করে যে অস্ত্র দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে হত্যার ইচ্ছায়ই সে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছে। ফলে তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা

হবে। কিন্তু কেউ যদি এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে যা দ্বারা সাধারণত মৃত্যু ঘটে না, তাহলে বিষয়টি ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলক্রমে হত্যার মাঝামাঝি পর্যায়ভুক্ত হবে। সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতের আগে হুমকি ধমকী দিয়ে থাকে তবে সেটি ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ। যদি বিবেচনা করা হয় এভাবে যে, সে যে অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা দিয়ে সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে না তবে সেটি ভুল হত্যাসদৃশ হবে। তখন এর ব্যাখ্যা হবে হত্যার ইচ্ছা তার ছিল না কিন্তু তার ইচ্ছা না থাকার পরও মৃত্যু ঘটে গেছে। এ মতের সমর্থনে একটি হাদীসও পাওয়া যায়।
হাদীসে বলা হয়েছে, 'খবরদার, ভুলবশত হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ। ভুল হত্যার দিয়্যত খুবই কঠিন। অর্থাৎ দিয়্যত হিসেবে একশ এমন উটনী দিতে হবে যেগুলোর পেটে বাচ্চা আছে।' কিন্তু হাদীস বিশারদদের দৃষ্টিতে এই হাদীসটি মুযতারাব এবং সনদের দিক থেকেও মজবুত নয়। এ ব্যাপারে ইবনে আব্দুল বার আলোচনা করেছেন, যদিও আবু দাউদ ও অন্যরা এটি সংকলন করেছেন।[৬]

ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যার উদাহরণ

উপরের আলোচনার পর বলা যায় যারা ভুলবশত হত্যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশের সমর্থক তাদের দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড সেটি যাতে হত্যাকারী এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল যার দ্বারা সাধারণত মৃত্যু ঘটে না। যেমন হাত দ্বারা অথবা ছোট কোন ডান্ডা অথবা চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিল কিন্তু অব্যাহত ভাবে আঘাত করেনি বরং একটি বা দুটি আঘাত করেছিল। এমন আঘাতে যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে এটিকে আকস্মিক মৃত্যু কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যাকাণ্ড বলা হয়।[৭]
পা দিয়ে যদি লাগাতার আঘাত করতে থাকে এমতাবস্থায় যদি মার খাওয়া ব্যক্তি মারা যায় তবে এটিকেও ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ্য হত্যা বলা হবে।[৮] ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, যেসব অস্ত্র ধারালো নয় এবং যেগুলো মানুষের শরীরে বিদ্ধ হয় না, এমন অস্ত্রের আঘাতে মারা গেলে এ মৃত্যুকে ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যাকাণ্ড বলা হবে। যেমন বড় কোন লাঠি, পাথর কিংবা ডান্ডা। অথবা ধারালো অস্ত্রের পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করা।[৯] ধারালো অস্ত্রের পিঠের দিক দিয়ে আঘাতে মৃত্যু হলে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী র.-এর দৃষ্টিতে সেটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে।[১০]

ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের পরিণতি

যারা হত্যার এই প্রকারকে স্বীকার করেন না, তাদের দৃষ্টিতে আলোচিত সবগুলোই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, তাই সবগুলোতেই কিসাস ওয়াজিব। আর যারা হত্যার এই প্রকারের পক্ষে তাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কঠিন দিয়্যত (Hard Blood Money) ওয়াজিব।[১১] সেই সাথে হত্যাকারী নিহতের মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে।[১২] অবশ্য এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কাফফারাও দেয়া আবশ্যিক কি-না।[১৩] তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব হবে না।[১৪]

আধুনিক আইনের সাথে শরয়ী আইনের পার্থক্য

আমরা আগেই বলেছি, ইমাম শাফেয়ী র. এর দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড সদৃশ হত্যাকাণ্ড সেটিই যাতে হত্যাকারীর নিহতকে আঘাতের ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু হত্যার কোন ইচ্ছা ছিল না। ইমাম যাইলাঈ র. কানযুদ্দাকায়েক এর ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে যে আঘাতের দ্বারা মৃত্যু ঘটে সেই কর্মটি করার ইচ্ছা থাকে বটে কিন্তু তাতে হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না। এই হত্যাকাণ্ডটি আধুনিক আইনের সেসব ধারার অনুরূপ যেসব ধারাতে এ ধরনের আঘাতের অপরাধের কথা বলা হয়েছে যে আঘাতে হত্যার ইচ্ছা না থাকলেও মৃত্যুর কারণ ঘটে। মিসরীয় আইনে এটি দণ্ডবিধির ২৩৬ দফা হিসেবে চিহ্নিত।[১৫]

ভুল হত্যাকাণ্ড

কোন কোন সময় লোকজন কোন বৈধ কাজে লিপ্ত থাকে কিন্তু জরুরী সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে অসতর্কতাবশত লোকজনের মৃত্যু ঘটে যদিও এতে কাউকে হত্যা করার আদৌ কোন ইচ্ছা থাকে না। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যাকাণ্ড বলে।[১৬] ভুল হত্যাকাণ্ড তিন প্রকার। যথা–

১. কাজের মধ্যেই ভুল হওয়া। যেমন কোন ব্যক্তি পাখি মারার জন্যে বন্দুক চালাল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলীতে কোন লোক নিহত হল। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে অপরাধী কাজের মধ্যেই ভুল করে। ফলে এটিকে কর্মে ভুল বলে অভিহিত করা হয়।[১৭]

২. সংকল্পে ভুল : যেমন ভুলবশত কোন মানুষকেই শিকার মন করে গুলী চালিয়ে দিল অথবা কোন মুসলমান নাগরিককে শত্রুপক্ষের লোক মনে করে ভুলবশত হত্যা করে ফেলল। এমতাবস্থায় অপরাধীর ভুল কাজে হয়নি। কারণ সে যাকে মারতে চেয়েছিল সে তাকেই আঘাত করেছে কিন্তু তার ধারণা ও আন্দাজের মধ্যে ভুল হয়েছে। ফলে এটিকে সংকল্পে ভুল বলে অভিহিত করা হয়।[১৮]

৩. উপরে উল্লেখিত দুটি ভুলের সমন্বয়ে তৃতীয় যে ভুলটি হয় তা হলো সংকল্প ও কর্ম উভয়টিতেই ভুল। যেমন শিকারী কাউকে হত্যা করার জন্যে গুলী চালাল। কিন্তু গুলী গিয়ে লাগল অপর কোন ব্যক্তির গায়ে, এমতাবস্থায় কর্ম ও সংকল্প উভয়টিতেই ভুল হয়েছে। কেননা সে একজন মানুষকে লক্ষ্য করে গুলী চালিয়েছে এটি সংকল্পের ভুল, সেই সাথে যাকে লক্ষ করে গুলী চালাল গুলী তাকে না লেগে আঘাত হানলো অন্য কোন ব্যক্তিকে, এটি কর্মের ভুল। এ প্রকারের ভুলের মূল ভিত্তি হল মানুষ একই সাথে অঙ্গ ও বিবেকের দ্বারা কাজ করে, তাই এই দুটির মধ্যে বা কোন একটির মধ্যে ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[১৯]

ভুল হত্যার বিধান

ভুল হত্যায় কিসাস ওয়াজিব হয় না, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নয়।[২০] কিন্তু Blood money রক্তপণ ও কাফফারা (money Expiation) ওয়াজিব।[২১] সেই সাথে হত্যাকারী নিহতের মীরাস ও অসীয়ত থেকেও বঞ্চিত হয়।[২২]

ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হত্যা

ভুল হত্যার সংগায় আমরা বলেছি যে, অপরাধী সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে চায় সেই কাজ বা সংকল্পে সে ভুল করে। এই ভুলের কারণে তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে অপরাধীর মধ্যে কর্মের ইচ্ছা পাওয়া যায় বটে কিন্তু তার ইচ্ছার মধ্যে হত্যার কোন সংকল্প আদৌ থাকে না, তবুও তার কর্মের দ্বারা অপরাধ ঘটে যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অপরাধ কর্ম ও কৃত অপরাধের মধ্যে একটা কারণগত যোগসূত্র (Relation of cause and effect) বিদ্যমান থাকে তাহলে এটি ভুল হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য হত্যাকাণ্ড বলে বিবেচিত হবে।[২৩] এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সব দিক বিবেচনায় ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা এটিও কোন ধরনের ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে।[২৪] যেমন এক লোক ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব বদল করল আর কেউ তার শরীরে চাপা পড়ে মারা গেল।[২৫] অথবা ছাদের উপর থেকে একজন পড়ে গেল। পড়তে গিয়ে অপরজনের উপরে পড়ায় একজন মারা গেল।[২৬] অথবা একলোক মাথায় করে বোঝা বহন করছিল, বোঝা কারো উপরে পড়ে মারা গেল। অথবা পতিত বোঝায় হোঁচট খেয়ে কেউ মারা গেল। শেষ অবস্থায় বোঝা নিয়ে রাস্তায় চলাচল করা যদিও বৈধ কিন্তু রাস্তায় নামার আগেই অন্যদের ক্ষতি-দুর্ভোগ না হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন লক্ষ স্থির করা কিংবা শিকারের জন্যে তীর ছোঁড়ার আগেই এর দ্বারা যাতে কারো ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।[২৭]

এ প্রকার হত্যাকাণ্ডও ভুল হত্যার পর্যায়ভুক্ত, কারণ হত্যাকারী যে বোঝা বহন করছিল সেই বোঝা পতিত হয়ে কিংবা তাতে হোঁচট খেয়েই লোকটি মারা গেছে। ফলে হত্যাকারীর কর্ম এবং নিহতের মৃত্যুর মধ্যে একটা কারণগত যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে।[২৮] গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুর ব্যাপারটিও এই প্রকার হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কেউ গাড়ি চালানো অবস্থায় যদি তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা যায়। কেননা গাড়িটি একটি যন্ত্রের মতো, যার নিয়ন্ত্রের ভার ছিল আরোহী বা চালকের উপর, যাতে হোঁচট খেয়ে কিংবা চাপা পড়ে লোকটি মারা গেছে। এর ফলে অভিযুক্তের কর্ম এবং লোকটির মৃত্যুর মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্ণ সতর্ক থাকতো তাহলে হয়তো সে এই হত্যাকাণ্ড রোধ করতে পারতো।[২৯]

যে হত্যাকাণ্ড ভুল হত্যাকাণ্ডের স্থলাভিষিক্ত তাও যে কোনদিক বিবেচনায় ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। এর বিধানও ভুল হত্যাকাণ্ডের বিধান তথা অপরাধীকে এই হত্যার অপরাধে দিয়্যত ও কাফফারা দিতে হবে এবং নিহতের উত্তরাধিকার ও অসীয়ত থেকে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে।[৩০] ভুল হত্যার কারণে দিয়্যত ওয়াজিব,[৩১] আর হত্যাকারী ও হত্যাকণ্ডের মধ্যে কারণগত যোগসূত্র থাকার কারণে হত্যাকারী নিহতের মীরাস ও অসীয়ত থেকে বঞ্চিত হবে।[৩২]

কারণগত হত্যাকাণ্ড[৩৩]

কারণগত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে কর্মটি সম্পাদিত হয় সেটি বৈধ হয় কিন্তু বৈধতার সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে সেখানে অপরাধের অনুপ্রবেশ ঘটে। যদিও এ ক্ষেত্রে হত্যা করার কোন সংকল্পই

হত্যাকারীর ছিল না তবুও তার কাজটি হত্যাকাণ্ডের পরিণতি লাভ করে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কর্ম ও হত্যার মধ্যে কোন ধরনের যোগসূত্র থাকে না। হানাফীগণ এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে 'কারণগত হত্যা' বলে অভিহিত করেন। কারণ একদিকে এটি ভুল হত্যার সংগায় পড়ে অপরদিকে এটি ভুল হত্যার পর্যায়ে পড়ে না। যদি অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয় যে, হত্যাকারীর মনে কর্মের এই পরিণতির কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না যা বৈধ কর্মটি সীমা লংঘন করার কারণে সৃষ্টি হলো। এতে মনে হয় ঘটনাটি ভুল হত্যাকাণ্ড কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে ভুল হত্যা আর এই হত্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য হলো, ভুল হত্যাকাণ্ডে সাধারণত কর্মের পরিণতিতে কর্তা অপরাধী বিবেচিত হয় কিন্তু কারণগত এ হত্যাকাণ্ডে কর্মের পরিণতি নয় এ ক্ষেত্রে কর্তার আয়োজিত কারণে সে অপরাধী বিবেচিত হয়।[৩৪]

শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ হত্যার এ প্রকারটিকে ভুল হত্যারই একটি ধরন মনে করেন। তারা এটিকে ভুল হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করছেন। কেননা এক্ষেত্রে হত্যাকারী বৈধ কর্মের সীমা লংঘন করে নিহতের মৃত্যুর কারণ ঘটায় যদিও তার মধ্যে হত্যার কোন ইচ্ছায়ই ছিল না।[৩৫] আর এটিই ভুল হত্যাকাণ্ডের মর্মকথা।

হাইওয়ে তথা সড়ক মহাসড়কে কেউ কোন জিনিস নিয়ে আসার কারণে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে সেগুলোও কারণগত হত্যার অন্তর্ভুক্ত। যেমন কেউ যদি কোন সড়ক পথে গর্ত খুঁড়ে রাখে, আর সেই গর্তে পড়ে কেউ মারা যায়। অথবা মহাসড়কে কেউ কোন পাথর বা গাছ রেখে দিল কেউ সেটিতে হোঁচট খেলো আর সেই হোঁচট তার মৃত্যুর কারণ হলো। উল্লেখিত দুটি অবস্থায়ই সেই ব্যক্তির জন্যে নাজায়েয। কারণ সড়ক বা মহাসড়কে এমন কোন জিনিস রাখা যার দ্বারা গণমানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা মোটেও জায়েয নয়। অতএব দুর্ঘটনায় যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে সবগুলোই কারণগত হত্যাকাণ্ড। কেননা সড়কে গর্ত খুঁড়ার কিংবা পাথর বা গাছ রাখার মতো নাজায়েয কাজের জন্যই সে কারণগত হত্যাকাণ্ডের অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[৩৬]

যেমন, কেউ যদি তার ঘরের সীমানা তার সীমা থেকে বেশি বাড়িয়ে ফেলে আর অতিরিক্ত জায়গাটিতে হোচট খেয়ে কোন লোক মারা যায়, এক্ষেত্রেও অপরাধী তার সীমা লংঘন করে অবৈধ কাজ করেছে। কোন বৈধ কারণ ছাড়াই সে জনসাধারণের ব্যবহার্য সড়ককে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। এর ফলে তাকে কারণগত অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে।[৩৭]

কোন লোক যদি সড়ক পথে কোন জানোয়ার তাড়িয়ে নিতে থাকে আর তার তাড়িয়ে নেয়া জন্তু যদি কাউকে পিষে ফেলে আর পিষ্ট লোকটি মারা যায় তবে এটিও কারণগত হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ তার হাঁকানো জানোয়ারের কারণেই তো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যদিও লোকটি সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি।[৩৮] (অবশ্য এই অবস্থাটা সড়ক পথে কোন জন্তুর উপর আরোহণকারীর দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা এই অবস্থায় সওয়ারীটাকে আরোহণকারীর হাতের অস্ত্র মনে করা হয়।)

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের অবস্থা এমনও হতে পারে যে, কোন লোক সড়ক পথে মালবাহী জানোয়ার নিয়ে যাচ্ছিল। মালবাহী জানোয়ারের উপর থেকে কিছু পড়ে গিয়ে কোন পথিক মারা গেল।[৩৯]

ঠিক অনুরূপ বিধান হবে কেউ যদি মহাসড়কে কোন জানোয়ার ছেড়ে দেয় আর সেই জন্তু কাউকে মেরে ফেলে তবে সেও কারণগত হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[৪০] কেউ যদি জনপথের উপর কোন জানোয়ার বেঁধে রাখে এবং সেই জানোয়ারের আঘাতে কোন লোকের মৃত্যু ঘটে এক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।[৪১] কারণ বর্ণিত সব কয়টি অবস্থায় অপরাধী কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ছাড়াই জনপথে জন্তুকে ছেড়ে দিয়ে অবৈধ কাজ করেছে। তার এই নাজায়েয কাজের কারণে সাধারণ পথিক আহত হয়েছে। আহত হওয়ার ফলে মৃত্যু হয়েছে। যেহেতু এই হত্যা জন্তুর মালিকের সরবরাহকৃত উপাদানের কারণে সংঘটিত হয়েছে, সরাসরি মালিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়; এজন্য এ ধরনের হত্যাকে কারণগত হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়।

কারণগত হত্যাকাণ্ড ও ভুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

যেসব ফকীহ্ কারণগত হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যাকাণ্ড থেকে ভিন্ন করে এটিকে হত্যার একটি প্রকার মনে করেন, তাদের অভিমত হলো, এক্ষেত্রে হত্যাকারী সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। তবে হত্যার কারণ অবশ্যই হয়েছে। এর বিপরীতে ভুল হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর কর্মই সরাসরি হত্যকাণ্ড ঘটিয়েছে। অনুরূপ ভুলহত্যা সদৃশ হত্যাকাণ্ডেও হত্যাকারীর কর্মই সরাসরি হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং সেটিই হত্যার কারণ ঘটায়। অনুরূপ ভুল হত্যার পর্যায়ভুক্ত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও হত্যাকারীর কর্ম সরাসরি হত্যার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব বদল করতে গিয়ে কারো উপরে পড়ে গেল। এমতাবস্থায় চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী মূলত পতিত ব্যক্তির শরীরের চাপের কারণেই মারা গেছে। অথবা কারো যানবাহনের চাপায় পড়ে কেউ মারা গেল। এমতাবস্থায় চালক বাহনেই সওয়ার থাকে এবং সেই বাহন চালায়। এমতাবস্থায় সাধারণত বলা হয়, চালকের কার্যের কারণেই লোকটি নিহত হয়েছে। মূল অপরাধীর কর্ম আর নিহতের মৃত্যুর মধ্যে তৃতীয় অন্য কোন কর্মের দখল নেই। কিন্তু কারণগত হত্যার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর কর্মের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকে না। এতে অন্য কোন জিনিসের সম্পৃক্ততা থাকে। যেমন কুয়া খননের কর্মটি যমীনের সাথে সম্পৃক্ত। কোন ধরনের স্থাপত্য কর্মে সীমা লংঘনের ক্ষেত্রে কর্মটি স্থাপত্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, উল্লেখিত অবস্থায় যমীনের কোন গঠনগত কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা কিংবা স্থাপত্য কর্মে সীমা লংঘনের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দায় সরাসরি অপরাধীর কর্মের উপর বর্তায় না। এক্ষেত্রে অপরাধী আসলে হত্যার কারণ বা অনুঘটক হয় মাত্র। যারা এমত ব্যক্ত করেন, তাদের কথা হলো, উল্লেখিত অবস্থায় অপরাধীর কর্ম এবং কর্মের কারণে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক অন্য জিনিসের সংশ্লিষ্টতার ফলে হয়ে থাকে।[৪২] ভুল হত্যাকাণ্ড আর ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্য নির্ণয়কারী ফকীহগণ বলেন, ভুল হত্যার পর্যায়ভুক্ত হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে হন্তারক নয়। হত্যার কারণ বা উপকরণ সরবরাহের কারণে সে হত্যাকারী হয়ে যায় না। কেননা, হত্যার উপকরণ বিদ্যমান থাকার কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটার পূর্ব পর্যন্ত আমরা নিহতকে মৃত বলতে পারি না। উপরোক্ত কথার সমর্থনে বলা যায়, মনে করুন– কুয়া খননকারী কিংবা সীমা লংঘন করে

স্থাপত্যকর্ম নির্মাণকারী মারা গেল। এরপর কূয়া কিংবা স্থাপনায় আঘাত খেয়ে কেউ মারা গেল, তাহলে আগেই মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আমরা কি হত্যাকারী বলবো?[৪৩]

যারা হত্যার এই পার্থক্য স্বীকার করেন না, বরং এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তাদের মত হলো, উল্লেখিত অবস্থায়ও যেহেতু অপরাধী তার বৈধ সীমা লংঘন করে অর্থাৎ হত্যার ইচ্ছা না থাকলেও এমন ভুলকর্ম করে বসে যার পরিণতিতে হত্যাকাণ্ড ঘটে ফলে এই হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যা বলেই অভিহিত করা হবে। ভুল হত্যাকাণ্ডের যে পরিণতি ঘটে এতেও একই পরিণতি ঘটবে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

শেষোক্ত মতটি আধুনিক মিসরীয় তাযিরী আইনের অনুরূপ। মিসরীয় তাযিরী আইনের ২৩৮ দফায় বলা হয়েছে, কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে ভুলবশত হত্যা করে কিংবা হত্যার কারণ হয়ে বসে। এক্ষেত্রে 'অথবা' শব্দটি হানাফীগণ যেগুলোকে কারণগত হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, সবগুলো অবস্থাতেই বোঝায় অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন হত্যাকাণ্ডের কারণ হওয়াটা ভুল হত্যারই অন্ত র্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মিসরের সবগুলো আদালতের রায়েই রয়েছে ঐকমত্য। ভুল হত্যা যেভাবে সরাসরি অপরাধীর কর্মের পরিণতি হয় অনুরূপ সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমেও তা হতে পারে।

উপরে উল্লেখিত মিসরীয় আইনের যে দফার কথা বলা হয়েছে তাতে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোর উল্লেখ রয়েছে– 'যেমন- বেপরোয়া, অসতর্কতা, অবহেলা, ক্রটি, অমনোযোগিতা, অসচেতনতা, অনিরাপত্তা এবং আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার কারণে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।'

আসলে বর্ণিত গোটা বাক্য একটি মর্মার্থকেই বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছে মাত্র। অর্থাৎ অপরাধীর কর্মের মধ্যে এমন কোন ক্রটি থাকা যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় ক্ষতিকর ফলে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অপরাধীর নিজে এই সংকল্প কখনো করেনি, কর্মের দ্বারা যে পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে। এই কর্মটিকেই ফকীহগণ কর্মে কিংবা সংকল্পে ভুল বলে অভিহিত করেছেন। অথবা বলেন, 'কোন কর্ম করার ক্ষেত্রে বৈধ সীমা এভাবে লংঘন করা যার ফলে হত্যাকাণ্ডের কারণ ঘটে। উপরের বিশদ আলোচনা থেকে এ জিনিসটাই প্রতিভাত হলো, ভুল হত্যা ও কারণগত হত্যার মধ্যে ফকীহগণের দৃষ্টিতে দুটি জিনিসের মিশ্রণ রয়েছে। এক, কর্মে ভুল দুই, উগ্রতা বা সীমা লংঘন। সেই সাথে হত্যার ইচ্ছা থেকে কর্মটি মুক্ত থাকা।[৪৪]

গ্রন্থকার বলেন, হানাফীদের মতের ব্যাপারে যারা ভিন্নমত পোষণ করেন আমি তাদের সাথে একমত পোষণ করি। আমার দৃষ্টিতে কারণগত হত্যাকাণ্ডও ভুল হত্যা। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ছাড়া অনিচ্ছাকৃতভাবে যতো ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেগুলোতে অপরাধীর কর্মে কোন না কোন ভুল অবশ্যই থাকে। সেই সাথে তার মধ্যে হত্যার সংকল্পও থাকে না।

কারণগত হত্যাকাণ্ডের বিধান

যেসব ফকীহ কারণগত হত্যাকাণ্ডকে হত্যাকাণ্ড বলেন, তারা বলেন, এক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হলো, তার দিয়্যত (রক্তপণ) আদায় করতে হবে। কেননা সেই তো হত্যার কারণ ঘটিয়েছে এবং

কর্মে সে বৈধতার সীমা লংঘন করেছে। তবে এক্ষেত্রে অপরাধীর উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়, সেই সাথে সে নিহতের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে অপরাধীর কর্ম ও পরিণতি তথা হত্যার মধ্যে সরাসরি কোন যোগসূত্র নেই।

আর যেসব ফকীহ কারণগত হত্যাকাণ্ডকে ভুল হত্যার একটি প্রকার মনে করন, তাদের দৃষ্টিতে ভুল হত্যার যে বিধান এটিরও সেই বিধান।[৪৫]

প্রমাণপঞ্জি

১. আলবাদায়ে আস্‌সানায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

২. আলবাদায়ে আস্‌সানায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬

৩. আস্‌সারাখ্‌সী, খণ্ড ২৬ মাতবায় আস্‌সায়াদাত, কায়রো পৃষ্ঠা ১৩১, আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৩৬, শরহে ফাতহুল কাদীর খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা-২৫৭ প্রথম সংস্করণ ১৩১৪ হিজরী, মাতবায় আমীরিয়া, বোলাক, মিসর, শরহে কানয ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ১০২-১০৫।

৪. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

৫. হত্যাকারী ও নিহতের রক্তে সমতা, এর শর্তাবলী, প্রতিটি শর্তের বিশদ বর্ণনা ও বিস্তারিত প্রমাণ এবং এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত জানার জন্যে দেখুন বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-৩৩৩-৩৩৫, আল আহকামুস্‌ সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২১৯-২২০।

৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা- ৩৩২-৩৩৩। আল আহকামুস্‌ সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২২১। তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০০-১০১।

৭. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৩৩। তিনি লেখেন, প্রথমত ফকীহগণ যে ব্যাপারে একমত তা হলো- ছোট ধরনের কোন লোহার ডাণ্ডা, পাথর অথবা চাবুক দিয়ে যদি আঘাত করে যেগুলোর আঘাতে সাধারণত মৃত্যু ঘটে না। অবশ্য প্রহার যদি এক বা দুবার করে থাকে, অব্যাহত প্রহার না করে থাকে। তিনি ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইচ্ছাকৃত এক বা দুবার প্রহারে যদি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা এ ধরনের দুএকটি প্রহারে হত্যার ইচ্ছা থাকে না। আদব ও শিষ্টাচার শেখানোর ইচ্ছাই থাকে। ফলে এতে সংশয় দেখা দেয়। বস্তুত সংশয় দেখা দিলে কিসাস রহিত হয়ে যায়।

৮. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-৩৩৩। এতে তিনি লিখেছেন, ছোট ধরনের চাবুক দিয়েও যদি এক নাগাড়ে পেটাতে থাকে আর তাতে মৃত্যু ঘটে যায় তবে সকল ফকীহদের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটি ইচ্ছাকৃত ভুল সদৃশ হত্যাকাণ্ড বলে সাব্যস্ত হবে।

৯. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৩৩৩। এখানে তিনি লিখেছেন, এক্ষেত্রে হত্যাকারীর হত্যার সংকল্প ছিল, তাই সে এমন অস্ত্র ব্যবহার করেছে যা দ্বারা সাধারণত হত্যাকাণ্ড ঘটে। অস্ত্রটি শুধুই ক্ষত সৃষ্টিকারী কিংবা তেলে দেয়ার মতো নয়। যেমন হাতুড়ী, বড় পাথর বা বড় ধরনের ডাণ্ডা। ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে এটিও ইচ্ছাকৃত ভুল হত্যাকাণ্ড সদৃশ।

১০. শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৯।

১১. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫১। তাবঈনুল হাকায়েক শরহুল কানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা-১০১। তিনি লিখেছেন, এতে গোনাহ ও কাফফারা রয়েছে কিন্তু কিসাস নেই তবে পূর্ণ দিয়্যত দিতে হবে। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩৩। আল আহকামুস্‌ সুলতানিয়া আল মাওয়ারদী- পৃষ্ঠা-২২১। মুগাল্লাযা দিয়্যত তথা পূর্ণ দিয়্যতের ব্যাখ্যায় আল মাওয়ারদী লিখেছেন, সোনা রূপার মধ্যে দিয়্যতে মুগাল্লাযার অর্থ হলো এর দিয়্যতের পরিমাণ ৩৩% বৃদ্ধি করা। দিয়্যত যদি উট দিয়ে পরিশোধ করা হয় তাহলে তাতে তিন

বছর বয়সী উট ৩০টি, চার বছর বয়সী হবে ৩০টি এবং ৫০টি উট দিতে হবে পাঁচ বছর বয়সী যেগুলো গর্ভধারণ করেছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, কঠোর দিয়্যত শুধু উটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সোনা রূপার ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রযোজ্য হবে না। বরং ইচ্ছাকৃত, ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশের দিয়্যতও ভুল হত্যাকাণ্ডের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ এক হাজার দিনার অথবা দশ হাজার দিরহাম দিয়্যত হিসেবে দিতে হবে। দিয়্যতের এই অংক তখনকার সময়ের হিসেব অনুযায়ী। বর্তমানের প্রেক্ষিতে এই অংক ও পরিমাণ পরিবর্তিত হবে। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১২৬।

১২. তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৩, আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫১।

১৩. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫১। শরহে কানয ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০৩। তিনি লিখেন, এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব। কেননা এটিও প্রকারান্তরে ভুল হত্যাকাণ্ড। ফলে এটিও ভুল হত্যাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ফকীহ বলেন, আবু হানিফা র.-এর দৃষ্টিতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব নয়।

১৪. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৩৪। তিনি লিখেন, একটি প্রহার বা দুটি প্রহারে যদি মৃত্যু হয় তাহলে হত্যার ইচ্ছা থাকলেও কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা এক বা দুবার প্রহারে সাধারণত মৃত্যু ঘটে না। এ ধরনের প্রহারে সাধারণত আদব শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য থাকে। ফলে এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ দেখা দেয়। আলকাসানী আরো লিখেছেন, আমাদের অনেক সঙ্গীর মতামত হলো, হালকা অস্ত্র দিয়ে একাধারে প্রহার করলেও কিসাস ওয়াজিব হবে না। আস্‌সারাখসী খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা- ১২২-১২৪। তিনি লিখেন, কেউ যদি বড় পাথর কিংবা মোটা কাঠ দিয় কাউকে হত্যা করে তবে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে কিসাস ওয়াজিব হবে।

১৫. মিসরীয় আইনের তাযিরী দফাটির ভাষা এরূপ, 'কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আহত করে কিংবা প্রহার করে অথবা কাউকে ক্ষতিকর কোন জিনিস দেয় কিন্তু এতে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা ছিল না তবুও মৃত্যু ঘটে গেল এমতাবস্থায় অপরাধীকে তিন বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া যাবে। উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা বোঝা যায় হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু কাজটি সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই করেছিল যার পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে গেল।

১৬. শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে তিনি লিখেছেন, এই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার অপরাধে অপরাধী নয় বরং সে অসতর্কতা ও অবহেলার অপরাধে অপরাধী। কেননা বৈধ ও হালাল কাজ অপরের কোন ক্ষতি না হওয়ার শর্তে করা যায়। তদুপুরি যদি কারো কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি অসতর্কতার অপরাধে অপরাধী। আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫২। এতে তিনি লিখেছেন, সতর্কতা ও সাবধানতার প্রচেষ্টা দ্বারা ভুল হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আল আহকামুস্‌ সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২২০, আল আহকামুস্‌ সুলতানিয়া আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা-২৫৭।

১৭. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৩৪। শরহে কানয ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে তিনি লিখেন- সংকল্পে ভুলের অর্থ হলো, কোন মানুষকে শিকার মনে করে কিংবা কোন মুসলমানকে শত্রু মনে করে তীর বা গুলী করা। এতে তার কাজে কোন ভুল হয়নি। কেননা সে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে কিন্তু ভুল হয়েছে সংকল্পে। কেননা একজন মুসলমানকে শত্রু মনে করেছে অথবা একজন মানুষকে শিকার মনে করেছে।

১৮. শরহে কানয্ ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে তিনি লিখেছেন, ইচ্ছা ও কর্ম উভয়টিতে সে ভুল করেছে। যেমন, কোন মানুষকে শিকার মনে করে তীর ছুঁড়েছে, তীরবিদ্ধ করেছে।

১৯. শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০১।

২০. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৫২। শরহে কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০১। এতে ইমাম যাইলাঈ লিখেছেন, তাতে কাফফারা ও দিয়্যত উভয়টি ওয়াজিব হবে। দিয়্যত ওয়াজিব হবে মৃত হত্যাকারীর বংশধর, উত্তরাধিকারী ও খান্দানের উপর। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা এবং নিহতের পরিবারকে পূর্ণ দিয়্যত দেয়া।'

হযরত উমর রা. তিন বছর এই বিধান কার্যকর রাখেন তাতে কোন সাহাবী ভিন্নমত পোষণ করেননি। ফলে এতে সর্বসম্মত ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। আল আহাকামুস্ সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০। আল আহাকামুস্ সুলতানিয়া আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৫৮।

২১. আস্সারাখসী, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা-৮২। তিনি লিখেন, কাফফারা এক দিক থেকে ইবাদত আবার অন্যদিক থেকে জরিমানা। মুবাহ ও হারামের মাঝামাঝি এর কারণগত অবস্থান। নিরেট মুবাহর উদাহরণ হলো, বৈধভাবে কাউকে হত্যা করলে সেটি কাফফারার কারণ হয় না। অনুরূপ নিরেট হারামের ক্ষেত্রে কাফফারা শুধু ভুল হত্যার বেলায় হয়ে থাকে। কেননা, ভুল হত্যার মূল কর্মটি হালাল থাকে। ভুলবশত কর্মটির পরিণতি যেখানে পতিত হয় সেটি থাকে হারাম।

২২. উল্লেখ্য ১৯৪৩ সালে জারী করা মিসরের উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৭৭-এ ইমাম মালেক র. এর মতামতকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ভুল হত্যাকাণ্ডের বিচারে হত্যাকারীকে নিহতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। অনুরূপ ১৯৪৬ সালে জারীকৃত মিসরীয় মীরাসী আইনের ধারা ৭১ এ ইমাম মালেক র. এর মতামত অনুসরণ করে ভুল হত্যাকারী অপরাধীর ক্ষেত্রে ওসীয়ত করা সঠিক মনে করা হয়।

২৩. আল কাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে যদি কারো উপর পড়ে গিয়ে মেরে ফেলে। এই হত্যাকাণ্ড ভুল হত্যার পর্যায়ে পড়ে। কেননা এই হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরাধীর দেহের ভারে হয়েছে।

ইমাম যাইলাঈ কানয্ এর ভাষ্যগ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে কারো উপরে পড়ে গিয়ে মেরে ফেললে এটি ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে পড়ে না। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন কাজের সংকল্প ছিলো না। যেহেতু কর্মটি তার দ্বারাই সাধিত হয়েছে এজন্য এটিকে ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

২৪. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, এই প্রকার হত্যা সবদিক থেকেই ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। যদি হত্যাকাণ্ডটি সরাসরি ঘটে থাকে।

২৫. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১।

২৬. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১।

২৭. শরহে যাইলাঈ আলা মাতানিল কানয্ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৪৬।

২৮. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, মনে করুন, কেউ তরবারী, ইট অথবা কোন কাঠ বহন করে নিয়ে জনপথ দিয়ে যাচ্ছে, আর সেটি কারো উপর পড়ে গিয়ে কেউ মারা গেল। এতে ভুল হত্যার উপাদান বিদ্যমান কেননা এক্ষেত্রে বহনকারীর হাতিয়ার অথবা পণ্য চাপা পড়েই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে।

২৯. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৭২। এতে তিনি লিখেছেন, আরোহী জনপথ ধরে যাচ্ছিল। তার সওয়ারী এক ব্যক্তিকে পিষ্ট করল। যেহেতু সওয়ারী আরোহীর নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত তাই আইনের দৃষ্টিতে তার কর্মের কারণেই লোকটির মৃত্যু ঘটেছে। শরহে কানয্ ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৩০. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, এটি সবদিক থেকেই ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। তাই এতে ভুল হত্যার শাস্তি কাফফারা দিয়্যত উভয়টি অপরাধীর উপর ওয়াজিব হবে এবং নিহতের উত্তরাধিকার থেকে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে। শরহে কানয্, ইমাম যাইলাঈ ৫ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা-১০১। তবে মিসরীয় উত্তরাধিকার আইন ধারা ৭৭ যা ১৯৪৩ সালে জারী করা হয় তাতে ভুল হত্যাকণ্ডের স্থলাভিষিক্ত হত্যাকাণ্ডে উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সেই সাথে ওসীয়ত সম্পর্কিত ১৯৪৭ সালে জারীকৃত ৭১ নম্বর ধারায় ভুল হত্যার স্থলাভিষিক্ত হত্যাকারীর ক্ষেত্রে নিহতের ওসীয়ত কার্যকর করার অবকাশ রয়েছে। উল্লেখিত উভয় ধারায় ইমাম মালেক র. এর মতামত অনুসরণ করা হয়েছে।

৩১. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, এ হত্যায় ভুল হওয়ার কারণে দিয়্যত ওয়াজিব সেই সাথে এর মধ্যে ইচ্ছা ও সংকল্প পাওয়া যায়নি।

৩২. আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, অপরাধী মীরাস ও ওসীয়ত থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ হলো, হত্যাকাণ্ডটি সরাসরি সংঘটিত হয়েছে। চাপা পড়ার কারণে লোকটির মৃত্যু ঘটেছে।

৩৩. ইচ্ছাকৃত হত্যার সংগায় আমরা হত্যার উপকরণ সরবরাহের বিষয়টি আলোচনা করেছি। এর বিধানও এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভিন্নতা জানার জন্য দেখুন, 'কতলে আ'মাদ, মাসিক তরজুমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৮ইং পৃষ্ঠা-৪৩।

৩৪. আলাকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭১। এতে তিনি লিখেছেন, এটি এমন পর্যায়ের হত্যাকাণ্ড যা ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়েও পড়ে। কারণ এতে হত্যার উপকরণ সরবরাহের ব্যাপার রয়েছে।

৩৫. আলআহকামুস্ সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০, আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, আল হাম্বলী, পৃষ্ঠা-২৫২-২৫৮।

৩৬. আস্সারাখসী খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা ৬ ও ১৪। শরহে কানয্ ইমাম যাইলাঈ পৃষ্ঠা-১০১ ও ১০২। আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৭৪। তিনি লিখেছেন, মনে করুন, বহুল ব্যবহৃত জনপথে কেউ কূয়া খনন করল, আর তাতে কোন লোক পড়ে মারা গেল। যদিও পড়ে গিয়ে মৃত্যু হওয়াটাই এতে মূল কারণ তবুও খননকারীকে এই মৃত্যুতে দিয়্যত দিতে হবে। কেননা, কূয়া খনন করাই ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটেছে। পৃষ্ঠা ২৮৭তে তিনি লিখেছেন, সেই ব্যক্তি পাথর কাঠ কিংবা কোন আসবাবপত্র রাখল অথবা সে নিজেই রাস্তার মধ্যে বসে পড়ল। ফলে এসব জিনিসের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কেউ মারা গেল। এমতাবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়্যত দিতে হবে। তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে না এবং উত্তরাধিকার ও ওসীয়ত থেকেও সে বঞ্চিত হবে না। কেননা সে সরাসরি হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। আল আহকামুস্ সুলতানিয়া আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০। আল আহকামুস্ সুলতানিয়া আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা-২৫৭।

৩৭. আস্সুরাখসী খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা-৫১। এতে তিনি লিখেছেন, কেউ যদি জনপথে পায়খানা তৈরি করে অথবা কোন ড্রেন খনন করে, অথবা দেয়ালের জন্য গর্ত তৈরি করে। এসবের মধ্যে হোঁচট খেয়ে পেড়ে কেউ যদি মারা যায়, তাহলে এসব জিনিসের স্থাপনাকারীর (স্থাপনাকারীর মৃত্যুতে) আপনজনদের উপর দিয়্যত ওয়াজিব হবে। কেননা এসব স্থাপনার সত্তাধিকারী ব্যক্তি তার বৈধ ক্ষমতা লংঘন করে অবৈধভাবে জনপথের মধ্যে এসব বাধা তৈরি করেছে। আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৭৮। আল আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২২০। আল আহাকামুস্ সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা পৃষ্ঠা-২৫৭।

৩৮. আলকাসানী খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা ২৭২। এতে তিনি লিখেছেন, হত্যাকারী জন্তুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এ অবস্থায় হলে সে কারণগত হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে। ২৮০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, এক ব্যক্তি জনপথ দিয়ে একটি জন্তু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় উক্ত জন্তু কাউকে পায়ে পিষ্ট করে ফেলল অথবা কাউকে গুতো দিল অথবা কাউকে আঘাত করল তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর এর দায় বর্তাবে। কারণ জনপথ অবাধে চলাচলের জন্য সবার জন্যে বৈধ। চলাচলের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা ও নিরাপত্তা ও অন্যের কষ্টদায়ক কর্ম ও তৎপরতা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব সেসব থেকে মুক্ত থাকা সবার জন্যে জরুরী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা তার আওতা বহির্ভূত ছিল না। ইচ্ছা করলেই সে এসব কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারতো।

৩৯. আস্সারাখসী, খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা-১৮৯। এতে তিনি লিখেছেন, জিন, লাগাম এবং এ ধরনের এমন কোন জিনিস কোন ভারবাহী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে জন্তু পরিচালনাকারী ব্যক্তির কাঁধে এর দায় বর্তাবে। কেননা এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

৪০. আস্সারাখসী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ১৯। এতে তিনি লিখেছেন, এক অভিযুক্ত ব্যক্তি তার জন্তুকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে এবং সেই জন্তু এক ব্যক্তিকে সামনে পেয়ে আহত করেছে। এতে জন্তুর মালিক এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী হবে। অনুরূপ জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনাকারীর কাঁধেও দায় বর্তায়, কারণ সেই তো জন্তুকে পরিচালনা করছিল কিন্তু তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৪১. আস্‌সারাখসী, খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা ১৯০। এতে তিনি লিখেছেন, কেউ জনপথের উপর কোন জন্তুকে দাঁড় করালো। জন্তুটি হাত পা বা লেজ দিয়ে কাউকে আহত করল, অথবা কাউকে কামড়ে দিল। অথবা তার মুখের লালা কিংবা ঘাম মাটিতে পড়ল তাতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোন পথিক মারা গেল, তাহলে এই হত্যার জরিমানা জন্তুর মালিকের উপর বর্তাবে। কেননা লোকটির মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্যে সে তার বৈধতার সীমা লংঘন করেছিল। কেননা জনপথের উপর কোন জীব জন্তুকে দাঁড় করিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। অবশ্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না, কারণ সরাসরি নিজ হাতে সে হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি।

৪২. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২৭২। শরহে কানয্‌, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১৫৯। আস্‌সুরাখসী, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা-১৪। এতে তিনি লিখেছেন, ভুল হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির কর্মটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু কূয়া খননকারীর কর্ম যুক্ত হয় যমীনের সাথে। ফলে অপর ব্যক্তি তাতে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর কারণ হয়।

৪৩. আসসারাখসী, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা-৬।

৪৪. আল আহকামুল আম্মাতু ফি কানুনিল উকুবাতি, ড. সাঈদ মুস্তফা সাঈদ, প্রকাশ ১৩৭১ মোতাবেক ১৯৫ খৃ. পৃষ্ঠা-১৩৯৪।

৪৫. শরহে কানয্‌, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-১০১-১০২। এতে তিনি লিখেন, কারণগত হত্যার শাস্তি হলো, হত্যাকারীর নিকটাত্মীয়ের উপর দিয়্যত ওয়াজিব কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব নয়। এজন্য দিয়্যত ওয়াজিব কারণ তারাই এই দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে এবং সীমালংঘনের মতো কর্ম করেছে। যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তি সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয় এজন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়। তিনি আরো লিখেছেন, প্রায় সব হত্যার শাস্তি র ক্ষেত্রে হত্যাকারী নিহতের মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু কারণগত হত্যাকাণ্ড এর ব্যতিক্রম। ইমাম শাফেয়ী এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এতেও ভুল হত্যাকাণ্ডের শাস্তি নির্ধারণ করেন। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা-২২০। আল আহকামুস্‌ সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮। আল মুগনী ইবনে কুদামা খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা-৩৩৮ ও এরপর। প্রকাশ ১৩৪৪ হিঃ।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৭

ইসলামে পানি আইন ও বিধিবিধান

মোহাম্মদ নূরুল আমিন

॥ পাঁচ ॥

আগেই বলা হয়েছে যে, পানির অনুসন্ধান এবং বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রতিটি তৎপরতা এবং স্থানীয় প্রথা-পদ্ধতি সর্বদা ভৌগোলিক অবস্থা ও অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে ইসলামের পানি নীতি ও বিধিবিধান সম্পদ ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে। এ কারণেই সম্ভবত যেখানেই পানির সংকট দেখা দেয় সেখানেই তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ জটিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত বলে মনে হয়। এই আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী নীতিমালা যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি মালিকানা ও ব্যবহার বিধি প্রণয়নের সময় বাস্তব চাহিদাকেও সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ভৌগোলিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে মালিকানা ও ব্যবহার বিধি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Jean Branhes একে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন[১] :

(১) অনিয়মিত পানি প্রবাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলী। এক্ষেত্রে পানি আইনের জটিলতা লক্ষণীয়।

(২) নিয়মিত সরবরাহ সম্পন্ন বিষয়াবলী। এক্ষেত্রে একটি দক্ষ বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় পানির ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করাই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ বিধির মূল লক্ষ।

(৩) প্রয়োজনাতিরিক্ত সরবরাহ সম্পন্ন পানির বিষয়াবলী। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রায়ই অকেজো থাকে। কেননা পানির অভাব না থাকায় সংশ্লিষ্ট অনেকেই নিয়ন্ত্রণ বিধি সঠিকভাবে পালন করে না এবং এ কারণে এ ক্ষেত্রে বিতরণ পদ্ধতিও শিথিল থাকে।

বিশেষজ্ঞগণ সাহারা মরুভূমির মরূদ্যানের পানির অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন[২], যা নিম্নরূপ :

১. ধারাবাহিক অথবা পর্যায়ক্রমিক প্রবাহবিশিষ্ট ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা।

২. আর্টিগান কূয়ার পানি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা।

৩. বদ্ধ পানির ব্যবহার।

৪. ঝরনার বা খালের মুখে বাঁধ দিয়ে প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্ত পানির ব্যবহার এবং

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক।

৫. কেন্দ্রীয় সাহারা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত পানির ব্যবহার।

পানি বিশেষজ্ঞ রোল্যাণ্ড[৩] নদী, সাধারণ কূপ, খননকৃত কূপ এবং আর্টসান কূপের পানি ব্যবহারের পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

হাইনেল[৪] উপত্যকা, পাহাড়, নদী, পাতকুয়া বা মানুষের খননকৃত খাল ও নালার পানিকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার আওতায় এনেছেন।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পানির ব্যবহার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ইসলামের পানি আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নে এ দিকটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। পানি যত দুষ্প্রাপ্য পানির নিয়ন্ত্রণ তত বেশি এবং বিধি বিধান তত পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়। যেখানে পানির প্রাচুর্য রয়েছে সেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকে শিথিল এবং বিতরণে নিয়ম কানুন অনসুরণ করা হয় না বললেই চলে।

পানির স্বত্ব

ইসলামের পানি আইন তৈরির বেলায় শরীআ আইনের প্রতি যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে মালিকানা স্বত্ব, তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার, সেচের অধিকার, খাল ও নালা পরিষ্কারকরণ, পরিদর্শন ও তদারকি এবং হারীম সংক্রান্ত আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় প্রথা-পদ্ধতিকে ভিত্তি করে আরো কিছু আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলো পানি স্বত্ব ও তার ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়ার লেনদেন, পরিদর্শন ও তদারক জলাশয়ের আওতা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এগুলো শরিআ'র সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এক সময় এই আইনগুলো সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে পালন করা হতো।

পানির মালিকানা

শুষ্ক ও অনুর্বর অঞ্চলে পানির মালিকানার প্রথাপদ্ধতি কতগুলো সাধারণ নীতিমালাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মরু-এলাকায় পানি হচ্ছে অন্যতম প্রধান সম্পদ। পানি দুষ্প্রাপ্য হবার সাথে সাথে জমি আনুপাতিক হারে আনুষঙ্গিক উপকরণে পরিণত হয়, পাশ্চাত্য আইনে যা অনুপস্থিত। এই ধরনের এলাকায় জমি প্রধান গুরুত্ব বহন করে না, এর গুরুত্ব নির্ভর করে উৎপাদনশীলতার উপর যা আবার সেচ স্বত্বের উপর নির্ভরশীল। পানির অভাব যত বেশি হবে উর্বরতার জন্য তার চাহিদা তত বাড়বে এবং এভাবে জমির তুলনায় পানির মালিকানা প্রধান হয়ে ওঠে।

মুসলমানরা দীর্ঘদিন স্পেন শাসন করেছে। এই দেশটি নাতিশীতোষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত। ইসলামী পানি আইনের সুন্দর একটা বিবর্তন এখানে লক্ষ করার মতো। ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলে এখনো পানি স্বত্ব ভূমি স্বত্বের সাথে সম্পৃক্ত। আইন অনুযায়ী এখানে ভূমি মালিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে পারেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী এখনো স্পেনে বেসরকারি

ব্যক্তিদের ভূমিস্বত্ব প্রদান করা হয়, তবে পানি যৌথ মালিকানার সম্পত্তি হিসেবে এখনো বিবেচিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এলাচি ও লারকা উপদ্বীপের সেচ এলাকাসমূহে এই ব্যবধান আরো স্পষ্ট, যেখানে স্বত্ব প্রভাবে ভূমি এবং পানির বিরোধ মিটানো হয়। প্রতিদিন প্রকাশ্য নিলামে পানি বিক্রি করা হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার শুষ্ক এলাকাসমূহের অবস্থাও একই রকম। এসব এলাকায় পানি ছাড়া জমি গুরুত্বহীন এবং এ প্রেক্ষিতে পানিই মালিকানার মুখ্য বস্তুতে পরিণত হয়। সেখানে পানি বেচাকেনা হয়, কখনো ওয়াক্ফ স্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অন্তর্ভুক্তি কখনো জমি ছাড়া, কখনো জমিশুদ্ধ।

পানি মালিকানার উৎস

পানি স্বত্ব ও পানি মালিকানার বিভিন্নমুখী উৎস রয়েছে। কেউ কেউ অনাবাদী জমি আবাদ করে পরে তার মধ্যে পানি পেয়ে এর মালিক হয়েছেন। আবার কেউ কেউ জলাধার নির্মাণ ব্যয়ে অংশগ্রহণ করে কিংবা ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে শরীক হয়ে পানির মালিকানা হাসিল করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত নদী-নালা-কূয়া, জলাধার প্রভৃতি তৈরির আনুপাতিক খরচ প্রদানের উপর মালিকানার পরিমাণ ও পরিসর নির্ভর করে। এই মালিকানার ধরনও বিভিন্ন; এটা ব্যক্তি কিংবা যৌথ মালিকানা যেমন হতে পারে তেমনি বিশেষ গোষ্ঠী, শহর নগর অথবা ওয়াক্ফ বা হেবানামার মাধ্যমে সামাজিক মালিকানাও হতে পারে। এই মালিকানা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য। কালপরিক্রমায় হয়ত দেখা গেছে, ব্যক্তি মালিকানা যৌথ মালিকানায় অথবা যৌথ মালিকানা সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত হয়েছে। পুরাতন মালিকরা তাদের মালিকানা হস্তান্তর করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়, উত্তরাধিকার, দানপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে মালিকানার এই হাত বদল হয়। তবে সাধারণভাবে ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য দলিলমূলে প্রদত্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ওয়াক্ফ বা হেবাভুক্ত সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয়।
সাধারণত সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর বা দানপত্রের প্রাথমিক অবস্থাতেই লিখিতভাবে পানি মালিকানার স্বত্ব নির্ণীত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা পানি অথবা ভূমির লেনদেন তদারকের জন্য নির্ধারিত সরকারি কর্মকর্তার সামনে (যেমন ভূমি অফিসার, সাবরেজিস্ট্রার কিংবা আমীন) নির্ধারিত নিয়মে এই দলিল সম্পাদন করা হয়, এর একটা কপি তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকে। পানি বা জমি সংক্রান্ত পরবর্তী লেনদেন রেকর্ডভুক্ত করে তারা এর হালনাগাদ অবস্থা সংরক্ষণ করেন।

পানি স্বত্বের ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র পানি ক্রয়-বিক্রয় এবং পানি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তবুও অবস্থা ও অবস্থার উপর ভিত্তি করে কোন কোন দেশে ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়ার কোন কোন পদ্ধতি বা সবগুলো পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের অনেক জেলায় ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির মালিকানাভুক্ত গভীর ও অগভীর নলকূপ

এবং শক্তিচালিত পাম্পসমূহ কর্তৃক উত্তোলিত পানি কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়ে থাকে। আবার বরেন্দ্র অঞ্চলে সরকারিভাবে এই পানির জন্য সেচ স্কীমের সদস্যদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করা হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পানি বিক্রির প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিও বিভিন্ন রকমের। কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট স্থান বা সময়ে পানির হাট বসে; যেমন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়, রোটেশানের শুরু বা শেষ সময় এবং যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে তাদের সভায় পানি ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী নির্ধারিত হয়, আবার পানির চাহিদা, মওসুম ও মূল্যের ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামেও পানি বিক্রির প্রথা চালু রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এক বা একাধিক প্রতিনিধি অকুস্থলে উপস্থিত থাকেন। পানির পরিমাণ ও গুণাগুণ, চাহিদা ও বিতরণের মওসুম, সময় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে পানির দাম নির্ণয় করা হয়।

পানি লেনদেনের সামগ্রিক তৎপরতা পানি স্বত্বকে প্রভাবিত করে এবং স্বত্বধারীদের মধ্যে অথবা স্বত্বধারী ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক কোনও চুক্তি হলে পানির লেনদেনে তুলনামূলক জটিলতা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

পানির স্বত্বও যে কোন সম্পত্তির স্বত্বের ন্যায় হস্তান্তরযোগ্য এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেউ যদি সামাজিক বা ধর্মীয় কোনও কাজে পানি স্বত্ব ওয়াক্ফ করেন তাহলে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে ওয়াক্ফ-এর প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিতে হয়। ওয়াক্ফ-এর ব্যবস্থাপনা, সুবিধাভোগী, সুবিধাভোগের শর্তাবলী এবং শর্তভঙ্গের ফলাফল অথবা যে প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াক্ফ করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠান যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহেল ওয়াক্ফ-এর অধীন সম্পত্তির কি হবে সে সম্পর্কেও এতে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা থাকে। বলা বাহুল্য, ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করা যায় না; ওয়াক্ফ-এর শর্তের ভিত্তিতে তার অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে। যেমন সম্পত্তির মূল মালিক একটা বিশেষ সম্পত্তি বা পানির আধার একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থার অনুকূলে ওয়াক্ফ করলেন এবং ঐ সংস্থাটি তা ভোগদখল করতে থাকলো। এক সময় দেখা গেল সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটেছে। এ অবস্থায় ওয়াক্ফ-এর শর্তানুযায়ী এ সম্পত্তি হয় সরকারী মালিকানায় চলে যাবে অথবা নির্ধারিত অন্য কোনও প্রতিষ্ঠাতা তা অধিগ্রহণ করবে। ব্যক্তি এবং সমষ্টি মালিকানার পাশাপাশি ইসলামে এভাবে ওয়াক্ফ ও হেবার মাধ্যমে জনকল্যাণে পানি সম্পদ ব্যবহারের অগণিত নজির রয়েছে।

ফ্রান্সের প্রখ্যাত গবেষক মওলিয়াস প্রায় সাত শত বছর পূর্বে আলজেরিয়ার টলগা মহকুমায় নিবন্ধনকৃত একটি পানি স্বত্বের উল্লেখ করেছেন। এই স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলটির ভাষা নিম্নরূপ :

'All the owners of this well have agreed upon a 14 day rotation system, alternating day and night as is customary in the region under commmunity condition. On the sunday turn Ali Ben Mohammad will have 42 hours of water and Lakdar Ben Mewand 6

hours. On the monday turn the children of Slimen Ben Hossain shall have 35 hours of water, 10 hours for Ahmed, 5 hours for his brother Mohammad, 5 hours for his brother Zerrank, 7.5 hours for then brother Abdelai and 7.5 hours for this nephew (the son of their brother) Saddak Ben Ali....'

প্রমাণপঞ্জী :

1. Brunhes Jean. Irrigation vs Geographical conditions, page 245.
2. Monlius Daniel, La Organisation Hydalque De vasis sahariennes.
3. Ronald George, Hydrologic da Sahara Algerien.
4.Haenel, Geroge, Da Morphologic and Hydrographic der oasen in der sahara.
5. Monlius Denial, ibid.

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ৫৮-৭৪

আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থা

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

আইন প্রধানত দু'ভাবে তৈরি হয়। একটি তৈরি হয় প্রথাগতভাবে এবং অপরটি হয় কোন বৈধ কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলীর মাধ্যমে। প্রথাগত আইনের ইতিহাস, সময় এবং আইনের রচয়িতা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। তবে যখন কোন বৈধ কর্তৃপক্ষ, যেমন রাজা-বাদশাহ অথবা কোন শাসক রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা বা প্রজা পালনের জন্য কোন আদেশ-নিষেধ জারী করেন তখন সেগুলোর কিছু প্রমাণ রয়ে যায়। আবার ইলাহী আইনও রয়েছে, যা আসে ভিন্নভাবে। অর্থাৎ এটি আসে একজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবীর মাধ্যমে, যিনি ঘোষণা দেন আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন সম্পর্কে কিন্তু এই আইনগুলো তাঁর নিজের প্রণীত আইন হিসেবে গণ্য হয় না। এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা নিশ্চিত করে জানি না প্রথাগত আইনগুলো কিভাবে এসেছে। তবে এমনটি হওয়া অসম্ভব নয় যে, এইসব প্রথাগত আইনের কিছু কিছু অংশ একসময় ইলাহী আইন হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল।

তাই সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, আমরা প্রকৃতপক্ষে দু'টি উৎস থেকে আইন পেয়ে থাকি। একটি মানব রচিত, অপরটি আল্লাহ্ প্রদত্ত। মানব রচিত আইনগুলো পরিবর্তনযোগ্য। যেমন একটি আইন কারো দ্বারা প্রণীত হওয়ার পর তার সমকক্ষ বা কোন একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ সেই আইনটি পরিবর্তন করে দিতে পারেন। যেমন একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যদি তার শ্রেণীকক্ষে কোন বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন তাহলে কোন ছাত্র বা সাধারণ স্তরের কোন কর্মচারী সেই নির্দেশ বদলানোর এখতিয়ার রাখে না। কেবলমাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অথবা কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ, যেমন শিক্ষামন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপ্রধান সেই নির্দেশটি পরিবর্তন করতে পারেন।

এই নিয়ম-নীতির একটি সুদূরপ্রসারী ফলাফল রয়েছে। আর এই কারণেই আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনগুলো কোনভাবেই পরিবর্তনশীল নয়। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ই তাঁর আইনের পরিবর্তন করতে পারেন। যদি কোন মানুষ তা করার দুঃসাহস দেখায় তাহলে সে আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। কেবলমাত্র একজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীর আদেশ-নিষেধগুলো আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারেন। কোন মানুষ এমনকি কোন

লেখক : জন্ম হায়দারাবাদ, ভারত। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষী ও গবেষক এবং কয়েকটি কালজয়ী গ্রন্থের লেখক।

রাজা, বিচারপতি অথবা কোন সমাজ সংস্কারক কোন ইলাহী আইনের পরিবর্তন করতে পারেন না। কেবলমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহই তাঁর প্রেরিত নবী-রসূল-এর মাধ্যমে এর পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখেন।

একটি আইনের পরিবর্তন নির্দেশিত হতে পারে আরেকটি আইনের মাধ্যমে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, তাওরাতের বিধি-নিষেধগুলো ইঞ্জীল শরীফে অথবা কুরআনের যুগে এসে পরিবর্তিত হতে পারে। কেননা ইঞ্জীল ও কুরআন উভয়ই আসমানী গ্রন্থ। তাই মূসা ও ঈসা আ.-এর যুগে প্রবর্তিত আইনগুলো মুহাম্মদ স. এর সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহই তাঁর প্রবর্তিত আইনগুলো তাঁর প্রেরিত নবী বা রসূলদের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারেন।

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা বিচার করব ইসলামী আইন কিভাবে তৈরি হল। হেরা গুহায় প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ইলাহী আইনের যে আগমন শুরু হয়েছিল তা শেষ হয় মহানবী স.-এর ইন্তিকালের মাধ্যমে। এর মাঝে থাকে তেইশ বছর। ইসলামী আইনের প্রধান গ্রন্থ আল-কুরআন কোন একটি স্থানে একই সময়ে পরিপূর্ণ গ্রন্থাকারে নাযিল হয়নি বরং সুদীর্ঘ তেইশ বছরে মানবজাতির জন্য যখন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই প্রত্যাদেশরূপে প্রেরিত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী আইন

এই পরিস্থিতিতে দেখা যায়, সর্বপ্রথম সূরা আল-আলাক-এর যে পাঁচটি আয়াত (৯৬: ১-৫) তা পড়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এখানে আইন কোথায়? কুরআন এবং হাদীসের প্রতিটি নির্দেশ এসেছিল পর্যায়ক্রমে। এমনকি এমনও প্রশ্ন করতে পারেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী আইনগুলো কি কি ছিল? কুরআন এবং মহানবীর জীবন ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, মক্কার মুসলমানগণের ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় প্রচলিত নিয়মাচার মেনে চলতে কোন বাধা ছিল না। তাই দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ত মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়নি ততদিন তা গ্রহণযোগ্য ছিল। ফলে এমনও হল যে, একজন সাহাবী মদ্যপান করা অবস্থায় নামায আদায় করতেন এবং সূরা তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু তাঁর মদ্যপ অবস্থায় তেলাওয়াতের ফলে সূরার শাব্দিক বিন্যাসের হেরফের হয়ে যেত। মদ্যপান ততদিনই গ্রহণযোগ্য ছিল যতদিন সে সম্পর্কে কোন প্রত্যাদেশ আসেনি। যদিও মহানবী স. জীবনে কখনও মদ্যপান করেননি তবুও তাঁর কোন কোন সাহাবী মাঝে মাঝে মদ্যপান করতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এই একই নীতিমালা সমস্ত বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথম প্রত্যাদেশে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হয়। আর এইসব তো সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, চুরি করা যাবে না, কাউকে হত্যা করা যাবে না, কারো সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না ইত্যাদি। সকল সমাজেই এই বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু মদ্যপান, শূকরের গোশত খাওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ মক্কায় প্রচলিত নিয়মই মেনে চলতেন যতদিন না ইসলাম এগুলোকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দেয়।

ইসলামের পূর্ববর্তী নবীদের নির্দেশিত আইনগুলোই ছিল আল্লাহর আইন যতদিন না সেগুলোকে রহিত বা পরিবর্তিত করা হয়। তবে সব আইনই যে রহিত করা হয়েছে তা নয়। যেমন তাওরাতে প্রবর্তিত আইন 'চোখের বদলে চোখ' কুরআনেও বলবৎ রয়েছে। ইহুদিদের এই বিশেষ আইনটি মুসলিম আইনের অংশ হয়ে গেছে।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, সূরা আন-নূর-এ বিবাহিত নারী-পুরুষের পারস্পরিক অবৈধ যৌনসম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কেননা এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান থাকায় তা ইসলামী আইনেও বলবৎ রাখা হয়েছে। এই আইনটি মহানবী স. ও খলিফাগণ প্রয়োগ করেছিলেন। 'আমাদের আগেকার ধর্মীয় আইনগুলো' এভাবেই ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং কুরআন ও হাদীস দ্বারা সেগুলোকে রহিত করা হয়নি।

ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হল হাদীস বা সুন্নাহ। যদিও হাদীসগুলো চিরন্তন তবুও প্রয়োজনে মহানবী স. এর জীবদ্দশায় এগুলোয় পরিবর্তন আনা যেত। কিন্তু মহানবীর ওফাতের পর হাদীসগুলোর কোনরকম পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। সুন্নাহর ভিত্তিতে এই আইনগুলো দুইভাবে লাভ করা যায়। একটি হল, সেসব বিষয় যা প্রত্যাদেশের মতই মহানবী স.-এর কাছে এসেছিল কিন্তু সেগুলো পবিত্র কুরআনের অংশ হয়নি। এমনকি আমরা যা জানি, কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী স. যা কিছু বলেছেন তা আল্লাহর নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন; তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ভিত্তি করে নয় (দ্র. ৫৩: ৩-৪)। মুসলমানগণ একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহানবী স.-এর প্রতিটি বাণী যা কুরআনের অন্ত র্ভুক্ত নয় তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশানুযায়ী এসেছে এবং তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেগুলো আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এমনকি যেসব বিষয়ে তিনি কুরআনের কোন দিকনির্দেশনা পাননি সেসব বিষয়ে তিনি কুরআনের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আর যেসব বিষয়ে কোন আসমানী নির্দেশ আসতে বিলম্ব হয়েছিল, সেসব বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে কার্য সমাধা করেছিলেন। এই ধরনের বিষয়গুলো স্থগিত বা পরিবর্তনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হত। যদি আল্লাহ সেইসব সিদ্ধান্তে কোনরূপ বৈসাদৃশ্য না দেখতেন তাহলে তা নীরবতা বা দ্রুত অথবা বিলম্বিত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন।

এক্ষেত্রে বদর যুদ্ধের ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যুদ্ধের পর যখন যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে কুরআনে পরিষ্কার কোন হুকুম ছিল না তখন মহানবী স. অর্থদণ্ডের বিনিময়ে আটক বন্দীদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু আল্লাহ দ্রুত প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে (দ্র. ৮:৬৮) এই বিষয়ে মহানবী স.-কে সতর্ক করে দিলেন। আল্লাহ মহানবীর এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে রহিত করলেন। যদিও এই আইনটি মূসা'র কিতাবে ছিল কিন্তু আল্লাহ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি এই আইনটি পরিবর্তন করবেন এবং এ বিষয়ে তিনি মহানবী স.-কে নতুন আইন মোতাবেক চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইসলামী আইনের উৎস

কুরআন এবং হাদীস ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হলেও এ দুয়ের ভিতর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর আইন। আর বিভিন্ন কারণে হাদীসের অবস্থান এর পরবর্তী স্তর। যদি আমরা মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে কোন আইন পেয়ে থাকি তাহলে সেই আইনটির মর্যাদা কুরআনী আইনের সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি মহানবী স.-এর জামানায় এমন একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে যে, সে শুধু আল্লাহর আইন অর্থাৎ কুরআনের আইন মেনে চলবে, কোন মানুষের তৈরি আইন মানবে না, তাহলে সে মুসলিম উম্মাহ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে। যে কারণে হাদীসের অবস্থান কুরআনের পরে অবস্থিত। তা হল মহানবী স. যখন ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের বিক্ষিপ্তভাবে থাকা আয়াতগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষণের তদারকি করছিলেন তখন তিনি হাদীস সংরক্ষণের জন্য তদনুরূপ কোন ব্যবস্থা নেননি। তাই হাদীসসমূহ সংবদ্ধভাবে গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর অনুসারীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

তাই পরবর্তীতে সাহাবীগণ হাদীসসমূহের উপর কাজ করতে গিয়ে দেখেন, এক ব্যক্তি একটি হাদীস যেভাবে ব্যক্ত করছেন অন্য ব্যক্তি তা সেভাবে ব্যক্ত করছেন না। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। সেই লোকটি হয়ত কোন বিদ্যান বা জ্ঞানীব্যক্তি নন অথবা একজন সাধারণ বেদুঈন হতে পারেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি হাদীসটি শুনার সময় পরিষ্কারভাবে এর প্রতিটি শব্দ শুনতে পাননি। হাদীসটির মূল বাণীটিই হয়ত তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে তিনি যখন এই ধরনের হাদীস অন্য একজনের কাছে ব্যক্ত করবেন তখন তার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে।

এখানেই হাদীস এবং কুরআনের বিশুদ্ধতার মৌলিক পার্থক্য। কুরআন সংরক্ষিত হয়েছে মহানবী স.-এর প্রত্যক্ষ তদারকির মাধ্যমে, আর হাদীসগুলো সংরক্ষিত হয়েছে সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। পরবর্তী কালে একটি হাদীস নিয়ে কাজ করার আগেই অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন প্রশ্নও উঠেছিল যে, হাদীসগুলোতে কি কোন প্রাথমিক দিকনির্দেশনা ছিল অথবা এগুলোর কার্যকারিতা কি শুধুমাত্র মহানবী স.-এর জীবনকালের ভিতর সীমাবদ্ধ? মহানবী স. কি এই হুকুমগুলো দেয়ার পর পরবর্তীতে তা রহিত করেছিলেন? এগুলো কি কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি সর্বজনীন? এই হাদীসগুলো লেখার সময় কোন পরিবর্তন হয়নি তো? অথবা মহানবী স.-এর পরবর্তী কালের প্রভাব হাদীসসমূহের ওপর পড়েছিল কিনা ইত্যাদি।

হাদীসের অবস্থান

এসব কারণেই হাদীসের অবস্থান কুরআনের পরে। তবে মনে রাখতে হবে, মহানবী স.-এর কোন আদেশ তিনিই যদি পরবর্তী কালে রহিত করে থাকেন তাহলে তা রহিত বলেই গণ্য হবে। এই রহিতকরণ বা কোনরূপ পরিবর্তনের অধিকার অন্য কোন ব্যক্তির নেই। বরং আমরা বিভিন্নভাবে হাদীসগুলোর সত্যতা যাচাই করতে পারি, এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোন হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেব।

আমাদের আশার বিষয় যে, ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে আমরা 'সিয়াহ সিত্তা' বলে গ্রহণ করেছি। এগুলো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আমরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগুলোতে সংকলিত হাদীসকে সঠিক বলে গণ্য করতে পারি। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিউ টেস্টমেন্ট বা ইঞ্জীল শরীফ হিসেবে যে কিতাবখানি আজ আমরা পাই বাজারে তার বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। খৃস্টান ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রিস্টের বা ঈসা'র মৃত্যুর তিন শত বছর পর এই কিতাবটি প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। আমাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই যে, হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যুর পর তিন শত বছর কিভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইঞ্জীল-এর বাণী প্রচারিত হয়েছিল।

বিপরীতে হাদীসের প্রতিটি বাণীর বর্ণনাকারীর নাম ও পরিচয় এবং মহানবী স.-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে। যেসব হাদীস গ্রন্থকে দুর্বল হাদীস গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয় সেসব হাদীসেরও সূত্র পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে বিশ্বস্ততা এবং বিশুদ্ধতার বিচারে অন্যান্য জাতির উঁচুমানের গ্রন্থসমূহের চেয়ে উক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো অনেক উন্নত।

আমরা জানি যে, হাদীসের প্রতিটি নির্দেশ সমান গুরুত্ব বহন করে না। এগুলোর কোনটি অবশ্য পালনীয়, কোনটি আবার উপদেশমূলক, আবার কোনটি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোন কোন বিষয় আবার আমাদের বিবেক-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে যা কিছু আমাদের জন্য কল্যাণকর তা অবশ্য পালনীয়, যা আমাদের জন্য অকল্যাণকর তা অবশ্যই বর্জনীয়। যেসব বিষয় আবার আপাতঃদৃষ্টিতে মঙ্গলজনক মনে হলেও এর ভিতর ক্ষতিকর দিক লুকিয়ে আছে সেক্ষেত্রে তা পালন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যে ক্ষেত্রে ভাল ও মন্দ দিক সমান সমান সে ক্ষেত্র নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তাই বলা যায়, যেসব বিষয় মানবজাতির জন্যে উপকারী বলে বিবেচিত তাই আমাদের পালন করতে হবে এবং যেসব বিষয় ক্ষতিকর বলে বিবেচ্য তা পরিত্যাগ করতে হবে।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীসের নির্দেশাবলীকে পাঁচভাগে ভাগ করার কাজ শুরু হয়। ইমাম গাযালী র. এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের মানবিক আইনের দর্শন সংক্রান্ত বইগুলোতে বিষয়টি প্রথম দেখা যায়। এখানে এই বিষয়টি বলা প্রাসঙ্গিক যে, কুরআনে ভাল ও মন্দ উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। ভাল দিকটিকে বলা হয় 'মা'রূফ' এবং মন্দ দিকটিকে বলা হয় 'মুনকার'। 'খায়ের' এবং 'শার' শব্দ দু'টিও ভাল ও মন্দ বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাধারণত মা'রূফ শব্দটি ব্যবহার করা হয় ভাল অর্থে এবং মুনকার শব্দটি ব্যবহার করা হয় মন্দ অর্থে।

মা'রূফ ও মুনকার-এর শাব্দিক অর্থ সবারই জানা রয়েছে। জনসাধারণের কাছে যা কিছু গ্রহণযোগ্য এবং তাদের কাছে ভাল বলে যুক্তিসংগত মনে হয় তা বাধ্যতামূলকভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সকলে যে বিষয়টিকে মন্দ বলে গণ্য করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে মা'রূফ ও মুনকার-এর ব্যাখ্যা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু। তিনি মন্দের

নির্দেশ দিতে পারেন না। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ ভাল দিকের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে, যদিও আমরা তাঁর অনেক নির্দেশের মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম নই। কুরআন ও হাদীস হচ্ছে আইনের স্থায়ী উৎস। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ স.-এর ওফাতের পর আর কোন নবী আসবেন না তাই কিয়ামত পর্যন্ত এই আইন বহাল থাকবে। কেবলমাত্র একজন নবীই পারেন তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবীর আইন রহিত করতে। যেহেতু মহানবী স.-ই শেষ নবী তাই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাঁর সুন্নাহ বলবত থাকবে এবং তাঁর নির্দেশগুলো আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহ-র কিছু বিষয় রয়েছে যা পালন করা বাধ্যতামূলক, কিছু বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং বাকিগুলো সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই। কিন্তু এই বিষয়গুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা যাবে না। যেমন যাকাত সম্পর্কে কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া আছে তা পালন করা বাধ্যতামূলক। তবে দান-খয়রাত সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে কিন্তু সেগুলো অবশ্য পালনীয় নয়। সেগুলো পালন করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

মহানবী স.-এর সময়কালে আইন তৈরির কৌশল

আমরা মহানবী স.-এর সময়কালে আইন তৈরির অন্যান্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তবে সেই আইনগুলো ছিল ক্ষণস্থায়ী। এগুলো মূলত ছিল বিভিন্ন ধরনের চুক্তি। মুসলমানগণ যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি করতেন এবং কোন কোন শর্ত মেনে নিতেন তখন সেগুলো সমস্ত মুসলিম জাহানের উপর বর্তাত। এসব চুক্তি মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর মূল্যহীন হয়ে যেত। শর্তগুলো যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুসলিম আইনের অংশ হত তখন তা সেই সময়ের পর অকার্যকর হয়ে যেত। কিন্তু যখন কার্যকর থাকত তখন তা কুরআন ও সুন্নাহ'র নির্দেশের মতই অবশ্যপালনীয় আইন হিসেবেই গণ্য হত।

উদাহরণস্বরূপ হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বলা যেতে পারে। এই চুক্তির ভিতর ছিল, মক্কার কোন মুসলমানকে মদীনার মুসলমানদের কাছে কোনভাবেই হস্তান্তর করা হবে না, যদিও সেই মুসলমান স্বেচ্ছায় মদীনায় গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবুও না। অধিকন্তু যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নেন তাহলে মদীনার মুসলমানগণ তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। যদিও এর শর্তগুলো একপাক্ষিক ছিল তবুও এগুলো মুসলিম আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুই বছর পর যখন চুক্তিটি রহিত হয়ে যায় তখন মক্কার মুসলমানদের ফিরিয়ে দেয়ার আইনটিও রহিত হয়ে যায়।

আইন তৈরির আরেকটি উৎস ছিল। তা হল, একটি নতুন আইন তৈরির সময় ইসলামী সরকার কখনও কখনও অন্যান্য দেশের চলমান আইনগুলো দেখে নিতেন। যেমন খলিফা ওমরের সময় সিরিয়ার গভর্নর সীমান্ত-বাণিজ্যের শুল্কহার নির্ধারণের ব্যাপারে খলিফার দিকনির্দেশনা চেয়েছিলেন। তখন খলিফা গভর্নরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অন্যান্য দেশের প্রধানগণ মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কি হারে সীমান্ত শুল্ক আদায় করেন তা অনুসরণ করার জন্য। এই নীতির

ব্যাখ্যা দিয়ে ইমাম আবু হানিফা'র একজন অনুসারী ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী বলেন, এই নীতি বিভিন্নভাবে বাস্তবায়িত করা হয়। এক্ষেত্রে যদি কোন রাষ্ট্র মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোনরূপ শুল্ক আদায় না করে তাহলে মুসলমান রাষ্ট্রের তরফ থেকেও কোনরূপ শুল্ক আদায় করা হবে না। এই আইন ততক্ষণই বলবৎ থাকবে যতক্ষণ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয় পারস্পরিকভাবে তা মেনে চলবে।

এই উৎসগুলো ছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইজতিহাদ। আমাদের বিচারকদের মতে ইসলামী আইনের চারটি মূল স্তম্ভ রয়েছে, যেমন- কুরআন, হাদীস, ইজমা (ঐকমত্য) এবং কিয়াস। মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় ইজমার বিষয়টি ছিল না।

কিয়াস বা সাদৃশ্যকেও ইজতিহাদ বলা যায়। কিয়াসের ব্যবহার মহানবী স.-এর জীবদ্দশাতেও প্রচলিত ছিল। হিজরী নবম সনে, মহানবী স.-এর ইন্তেকালের দেড় বছর আগে তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেন-এর বিচারপতি করে পাঠাবার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সামনে কোন একটি বিষয় এলে তুমি তা কিভাবে সমাধান করবে? উত্তরে মুয়ায বললেন, তিনি কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তার সমাধান করবেন। এরপর মহানবী তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন, যদি কুরআনে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা না থাকে তখন কি করবে? তিনি উত্তরে বললেন, এক্ষেত্রে সুন্নাহর আশ্রয় নেব। তারপর মহানবী স. তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন, যদি সুন্নাহতেও কোন পরিষ্কার দিকনির্দেশনা না থাকে তাহলে কি করবে? তখন মুয়ায উত্তর দিলেন, তিনি তাঁর নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর ভর করবেন। মহানবী স. এই উত্তরে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, 'হে মহান প্রতিপালক, তুমি তোমার দূতকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছো সে খুশি।' এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কার কোন নির্দেশ না পেলে একজন মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ইজতিহাদ-এর মাধ্যমে একটি আইন তৈরির প্রাক্কালে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, একটি সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধান সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা পরিষ্কারভাবে দেয়া নেই। অথচ সেই সমস্যার কাছাকাছি একটি সমস্যার সমাধান দেয়া আছে। যেমন কুরআনে চুরির বিষয়ে একটি আইন দেয়া রয়েছে, কিন্তু কাফন চুরির বিষয়ে কিছু বলা নেই। সেক্ষেত্রে বিচারক কি করবেন? একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এই চুরির কারণ দেখে হয় চুরির অপরাধের শাস্তি সরাসরি প্রয়োগ করবেন নতুবা আইনটিকে প্রয়োজনমত সংশোধন করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করবেন। এই পদ্ধতিকে ইসতিহসান বলে। কেননা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি নতুন আইন লাভ করি যা পরিস্থিতির বিবেচনায় ভাল অর্থাৎ মুসতাহসান। জাতির মঙ্গলের বিষয়টিও এই নীতিমালার ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে।

এইসব সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণে ইজতিহাদ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। হযরত মুহাম্মদ স.-এর যুগেই এর সূচনা হয়। এই নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আইন প্রণয়নের একটি নতুন মাধ্যম

পাই। অর্থাৎ কিয়াসের ভিত্তিতে একটি বিচার ব্যবস্থা। যেমন একজন কাজী তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধিতে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তিনি হয়ত কুরআন অথবা হাদীস থেকে কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাননি। যেহেতু তিনি একজন বিচারক তাই তিনি একটি সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। তিনি নবীজীর সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ নাও পেতে পারেন। এমনটি হতেই পারে। এমনকি সেই বিচারক তাঁর নিজের বিচার সম্পর্কে সন্দেহও করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। মহানবী স.-এর জামানায় কেন্দ্র থেকে যে উত্তর আসবে সেটাও আইনের একটি অংশ হয়ে যাবে, কেননা এটি তখন সুন্নাহ বলে বিবেচিত হবে এবং তখন সেই বিচারের জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়বে না। আরেকটি সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেই বিচারক সিদ্ধান্তের জন্যে মহানবী স.-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন নাও করতে পারেন। কিন্তু মহানবী স. বাদী-বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কোন লোক মারফত সেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলেন। তিনি আইন প্রণেতা হিসেবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন কিন্তু সর্বোচ্চ অধিকর্তা হিসেবে নয়, এবং নির্দেশ দিলেন, বিচারক অথবা গভর্নর একটি নির্দিষ্ট পন্থায় এগিয়ে যেতে পারেন।

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, মহানবী স. বিচারক এবং গভর্নর উভয়ের জন্যই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নির্দেশ পাঠিয়েছেন। একটি অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ ছিল এবং এক্ষেত্রে রক্তের অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হল। প্রচলিত প্রাচীন নীতি অনুযায়ী রক্তের অর্থ-মূল্য (দিয়াত) শুধু দেয়া হত নিহতের পুরুষ আত্মীয়কেই। নতুন আইনে মহানবী স. নিহত ব্যক্তির বিধবাকে তার অংশ পরিশোধ করার আদেশ দিলেন। কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক রক্তের অর্থ-মূল্যের অংশ দেয়া হল উত্তরাধিকারদের। যেমন স্ত্রী, পুত্র কন্যা, মাতা-পিতা এবং অন্য নিকটাত্মীদের। রক্তের অর্থ-মূল্যের এই নির্দেশনা একইভাবে প্রযোজ্য থাকবে। এই উদাহরণগুলো এই কৌশলের দিকনির্দেশনা দেয় যার মাধ্যমে মহানবী স.-এর যুগে আইন প্রণীত হত।

ইজমা

ইজমা তথা ঐকমত্য আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে এটি মহানবী স.-এর পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয়। ইজমার অর্থ হল যদি কুরআন ও হাদীসে সমস্যার সরাসরি কোন সমাধান উল্লেখ করা না থাকে সেক্ষেত্রে ইসলামী পণ্ডিতগণ সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে। তাই ঐকমত্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

অধিকন্তু, হানাফী মাযহাবমতে, এটি একদিকে যেমন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয় অপরদিকে তেমনি কোন অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তও নয়। তাঁরা মনে করেন, একটি পুরোনো সিদ্ধান্তকে নতুন একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্তও খারিজ করে দিতে পারে। ইমাম আল রাজী-ও এই মত পোষণ করেন। খ্যাতিমান বিচারপতি আবুল ইয়াসির আল্ বাযদাবি তাঁর আইন বিষয়ক বিখ্যাত বইয়ে একই মত প্রকাশ করেছেন। একজন মানুষের রচিত আইন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকজন মানুষ দ্বারা

পরিবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। ইমাম আল-রাজী এই মতের সঙ্গে একমত। এটি ইসলামী আইনের বিশাল উপকার করেছিল। তবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরীকৃত আইন কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ স. এর নির্দেশিত আইনের সমকক্ষ হতে পারে না। কেননা এই আইন তৈরি হয় মানুষের মতামতের ভিত্তিতে। তাই তা পালনে আমরা পুরোপুরিভাবে বাধ্য নই। একটি মানব রচিত আইন ভিন্ন পরিস্থিতির ভিত্তিতে অন্য একজন মানুষ দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। তাই দেখা যাবে যে, পুরোনো মতামত নতুন আলেমদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

ইসলাম-পূর্ব আইন ব্যবস্থা

আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে খানিক আলোচনা করতে পারি, যা আমাদের আলোচ্য বিষয়েরই আরেকটি দিক। আমরা মহানবী স.-এর যুগের বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনার আগে ইসলাম-পূর্ব যুগে বা আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরবে কিভাবে এই ব্যবস্থা বহাল ছিল সে বিষয়টির প্রতিও দৃকপাত করতে পারি। এক্ষেত্রে দেখা যাবে কিভাবে মহানবী স. এই ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন। আরবের অন্ধকার যুগে বেদুঈন গোত্রগুলোর কোন শাসক বা গভর্নর ছিল না। এমনকি তাদের কোন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকজন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিত। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলে প্রতিশোধ নেয়া সহজ হত, তবে, প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলে সেক্ষেত্রে প্রতিশোধের সম্ভাবনাও ক্ষীণ হত। যেসব ক্ষেত্রে উভয়ে শক্তিশালী হত সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হত। এক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী সমস্ত বিষয়টি ভালভাবে জেনে-শুনে যে রায় দিতেন তাই সবাইকে মেনে নিতে হত। ইসলাম-পূর্ব যুগের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তায়েফের সন্নিকটে উকায-এর মেলা বসত। দেশ-বিদেশের অনেক লোক এখানে অংশগ্রহণ করত। মেলা চলাকালীন তারা কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করত। সে সময়ের জন্য কিছু লোককে বিচার কাজের জন্য স্বল্পকালীন নিয়োগ দেয়া হত। কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে অনেক সময় গণ্ডগোল সৃষ্টির আশঙ্কা থাকত। সবাই জানত বিচার কাজের সেই ব্যক্তিগণ কারা। অনেকেই আবার তাদের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোর সুবিচার পাওয়ার আশায় উকাযের মেলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করত। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরবের অন্ধকার যুগেও বিচার ব্যবস্থার কিছু ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিদ্যমান ছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে, মক্কার বিষয়টি বিশেষ করে বলা যায়, এখানে নাগরিকদের বিভিন্ন বিবাদ মীমাং-সা করার জন্য তিনটি বিচার প্রতিষ্ঠান ছিল। একটি ছিল সিভিল কোর্ট যা পরিচালনা করতেন আবু বকর। আরেকটি ছিল ক্রিমিনাল কোর্ট। এছাড়াও অপর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যার নাম হিল্ফ আল-ফুযুল। এই সংগঠনটি মক্কার স্থানীয় ও অস্থানীয় নির্বিচারে সকল মজলুমের পক্ষে কাজ করত। একসময় মক্কার লোকজন দেখল যে, মক্কায় আগত বিদেশীদের অসদাচরণের ফলে শহরটির দুর্নাম বেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন আবু জাহেলের আচরণের ওপর একটি কবিতা লিখে ফেলেছিল।

এই কবিতায় মক্কা নগরীর বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্যও ছিল। আবু জাহেল বিষয়টি গায়েই লাগাল না, কিন্তু মক্কার লোকজন এই ঘটনায় ভীষণ কষ্ট পেল। এই ঘটনার পর মক্কার সবাই মিলে স্বতস্ফূর্তভাবে নগরীর স্থানীয় ও অস্থানীয় নির্বিশেষে সকল মজলুমকে সহযোগিতা করার জন্য একটি আইনসম্মত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অথচ মদীনায় এই ধরনের বিচার ব্যবস্থা স্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করত।

ইসলামী আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী স. একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন। তখন ন্যায়বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় রাষ্ট্রের ওপর। ফলে মজলুম জনতা তাদের ন্যায়বিচারের ভার নিজেরা না নিয়ে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থার ওপর অর্পণ করে। পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ একজন বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে বিচার কাজ পরিচালনা করা হয়। তিনি উভয় পক্ষের কথা শুনে কোনরকম ভয় ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়া রায় দিতেন। এখানে আরেকটি বিষয় ছিল। তা হল, কোন ব্যক্তি কোন অপরাধীকে সমর্থন করতে পারত না, যদিও সে তার নিজের সন্তান হত। যদি কারো সন্তান কাউকে হত্যা করত তাহলে তার পিতা তার নিজের সন্তানের পক্ষ নিতে পারত না অথবা তার সন্তানকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার কোন কৌশল নিতে পারত না। বিপরীতে এই ন্যায়বিচারকে ইলাহী বিধান বলেই গণ্য করা হত। তাই সবাই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেতভাবে সহযোগিতা করতেন।

মদীনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই উদাহরণ একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে বিষয়টি সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গেল। এই উন্নয়নের ফলে মদীনায় আরো দু'টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে তা সারা দেশে বিস্তার লাভ করল। একটি প্রতিষ্ঠান হল মুফতী অপরটি কাজী। মুফতীর কাজ হল, বিভিন্ন আইনগত দিক বিবেচনা করে তাঁর মতামত দান। তিনি আইনগত বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতেন, কিন্তু আইন প্রয়োগের দায়িত্ব তাঁর অধীন ছিল না। কাজী পালন করতেন একজন বিচারকের ভূমিকা। মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় অনেক কাজী নিয়োজিত ছিলেন, তবে মদীনায় কোন স্থায়ী কাজী ছিলো না। এ বিষয়ে আমরা কোন লিখিত দলিল দেখতে পাই না। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, মহানবী স. তাঁর কোন একজন সাহাবীকে নিয়োগ দিতেন। তিনি বিষয়কে ভালভাবে জেনে, দুই পক্ষের যুক্তি-তর্ক ভালভাবে শুনে তাঁর সিদ্ধান্ত দিতেন। ফলে যখন সেই সাহাবী বিচারের রায় দিতেন তখন সেই রায়কে মহানবী স.-এর নিজের দেয়া রায় বলে সম্মান করা হত।

এই সূত্রে আমরা একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি, যার বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়টি আমর ইবনুল আস রা.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। মহানবী স. তাঁকে একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জেনে রায় দিতে বললেন। 'কিন্তু কিসের ভিত্তিতে?', সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন। বিষয়টি মহানবী স. তৎক্ষণাত বুঝতে পারলেন এবং

প্রত্যুত্তরে বললেন, যদি আমর সঠিকভাবে বিচার করতে পারে তাহলে সে অনেক সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে, যদি সে সঠিক রায় দিতে না পারে, অথচ যদি দেখা যায় যে, তার উদ্দেশ্য ভাল ছিল তাহলেও সে সওয়াব পাবে। কেননা সে ন্যায়বিচারের চেষ্টা করেছিল।

বিচারকদের মতপার্থক্য

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিচারকদের পারস্পরিক মতপার্থক্যগুলো লক্ষ করতে পারি। এই মতপার্থক্য মহানবী স.-এর সময়কালেও ছিল, তবে পরবর্তীতে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এটি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যার ফলে ইমাম আবু হানীফা র. ইসলামী আইন সঙ্কলন করার জন্য চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে একটি নতুন একাডেমি গঠন করেন। সেই সময় দেখা গেল, একজন বিচারপতি একটি রায় দিলে অন্য একজন বিচারপতি একই বিষয়ে তার থেকে একেবারে ভিন্ন একটি রায় দিচ্ছেন। ইবনুল মুকাফফা খলিফা আল মনসুর-কে লেখা তাঁর 'আর-রিসালাহ ফিস সাহাবাহ' নামক একটি চিঠিতে অভিযোগ করে বলেন, এইসব মতপার্থক্য বিচারকদের ভিতর ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি করছে। একই বিষয়ের ওপর দুইজন বিচারক দু'টি পরস্পর বিরোধী রায় প্রদান করছেন। একজন যদি মৃত্যুদণ্ড দান করেন তাহলে অপরজন তাকে মুক্তি প্রদান করছেন। এক কথায় বলা যায় যে এর ফলে নাগরিক জীবনে কোন নিরাপত্তাই আর থাকল না। অনেক বিষয়ে লোকজন ধারণাই করতে পারতেন না যে, সঠিক রায় কি হতে পারে। ইবনুল মুকাফফা খলিফা আল মনসুর-এর কাছে একটি প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে, তিনি যেন বিচারকদের নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের বিচারের রায়ের একটি অনুলিপি খলিফার কাছে প্রেরণ করেন। তিনি যদি বিচারে কোন রকম অসামঞ্জস্যতা পান তাহলে তিনি সে বিষয়ে প্রবল প্রতিবাদ করেন। খলিফার নির্দেশ বিচার ব্যবস্থায় এই মত-পার্থক্য দূর করতে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করতেন। বিচারকগণ যদি তাঁদের বিচারের রায় খলিফার কাছে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠান তাহলে খলিফা একটি নির্দিষ্ট মামলার ওপর সমস্ত অঞ্চলে একটি অভিন্ন রায় বাস্তবায়ন করতে পারবেন। খলিফা আল-মনসুর তখন ইবনুল মুকাফফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মহানবী স.-এর জীবনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামী আইন ব্যবস্থায় এই ঐহিত্য বিদ্যমান রয়েছে যে, বিচার ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন কখনও সরকার বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অধীন নয়। খলিফা আল-মনসুর যদি ইবনে আল মুকাফফার প্রস্তাব মেনে নিতেন তাহলে বিচারব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়নের এই ব্যবস্থাটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা খলিফার অধীনে চলে যেত। খলিফাদের ভিতর ভাল লোকও ছিলেন আবার খারাপ লোকও ছিলেন। ফলে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমটি ব্যক্তিবিশেষের মর্জিমাফিক হয়ে যেত। দেখা যেত একজন নতুন খলিফা তাঁর পূর্ববর্তী খলিফার প্রবর্তিত বিষয়গুলো পরিবর্তন করে দিচ্ছেন।

আমরা আশা করতে পারি, এই দৃষ্টিভঙ্গি মহানবী স.-এর যুগ থেকে আইন প্রণয়ন এবং বিচারে প্রয়োগ হত। বিচারপতিদের নিয়োগপত্র সংক্রান্ত চিঠিগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনো

অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আবু মূসা আল-আশ'আরী' রা.-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন বিচারকের বিভিন্ন মতামতের দলিলগুলোও এখনো অনেকাংশে অবিকৃত রয়েছে। এইসব বিচারকদের বিচার ব্যবস্থা থেকে অনেক তথ্য আমরা পেতে পারি। তারা কিভাবে আইন এবং বিচারব্যবস্থার মত দু'টি ভিন্ন বিভাগের ভিতর সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, সেগুলো থেকে কিভাবে সহায়তা পেয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করেছেন সে সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারণা পেতে পারি। এই বিষয়গুলো শুধু মদীনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনটি মহাদেশে প্রসারিত মুসলিম জাহানে পরিব্যপ্ত ছিল।

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : যদি আইন প্রণয়ন একটি ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হয় তাহলে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে এইসব আইন কিভাবে ব্যবহৃত হবে? আইন প্রণয়নকারী হবেন কারা এবং কিভাবে তিনি ঐকমত্য প্রয়োগ করবেন?

উত্তর : এটা আমাদের ঐতিহ্য যে, আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকা থাকে না। তা সংসদ বা সরকারের কর্তৃত্বেও সংরক্ষিত থাকে না। প্রত্যেক বিচারপতি যে কোন বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাসকদের দূরে সরিয়ে রাখলে মুসলিম সমাজে কোন জটিলতার সৃষ্টি হবে না। কদাচিৎ এমন হতে পারে যে, একজন খলিফা একটি আইনকে অবজ্ঞা করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উমর রা. একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন যে, বিজিত রাষ্ট্রের দখলকৃত সম্পত্তি কেবল বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর একক সম্পত্তি না ভেবে বরং পুরো জাতির সম্পত্তি হিসেবে সম্মান করা উচিত।

এই অধ্যাদেশ, হঠাৎ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল কিন্তু সাধারণভাবে আইন প্রণয়ন করা হয় বিচারকদের দ্বারা আলাদা আলাদা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। আমরা আগেই বলেছি, যদি সম-পর্যায়ের একজন ব্যক্তি একটি মতামত প্রকাশ করেন, আমাদের পক্ষে তার সমালোচনা করা সহজ এবং তার পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দেয়াও সহজ। পক্ষান্তরে, একজন স্বৈরাচারী শাসকের কোন মতের বিপক্ষে মত দিতে অনেকেই দ্বিধান্বিত হবেন।

ইসলামের প্রথমদিকে কাজীগণ কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে কোন বিষয়ের ওপর নির্দ্বিধায় ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করতে পারতেন। যদি তাঁরা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট দিক-নিদের্শনা না পেতেন তখন তাঁরা অন্য কোন সম্মানিত বিচারকের মতাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। যদি তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট না হতেন তবে তাঁরা তাঁদের বিবেক-বুদ্ধি মোতাবেক স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেন।

আইন প্রয়োগের ব্যাপারে সাধারণত আমাদের বিচারক বা বিচারকার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ তাদের বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো পুলিশের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেন। এই ব্যবস্থাটি কি এখনও সম্ভব এবং মানানসই? এই প্রসঙ্গে আমরা সবাই হয়ত বলব, আমাদের আইন ব্যবস্থা ইসলামী আইনের সঙ্কলক ইমাম আবু হানীফা র.-র যুগের চেয়ে অনেক প্রসারিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক।

যদিও সুসংহত বিধিবদ্ধ আইনের সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান, তবে স্বচ্ছ আইন-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। হানাফী আইন কি? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন আমরা হিদায়া, কুদুরী এবং মাবসুত নামক বইগুলো দেখি, আমরা হানাফী এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের ভিতর বিরাজমান পার্থক্যগুলো অনুধাবন করতে পারি। এটাও সম্ভব ছিল যে একটি দেশের কাজীগণ বিচার-কার্য সংক্রান্ত রায়গুলো দেয়ার সময় তাঁদের ব্যক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগানোর পাশাপাশি তাদের পসন্দের মাযহাব, তথা হানাফী, শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের দেয়া ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রাখতেন। আব্বাসী খিলাফতের সময় ইমাম আবু ইউসুফ র.-কে বলা হয়েছিল, কাজীদের কাছে এই নির্দেশনা দিয়ে দেয়ার জন্য যে, তারা যেন হানাফী আইন মোতাবেক বিচারের রায় দেন। ইয়াকুত-এর নথি থেকে জানা যায়, যেসব কাজী হয়ত মুতাজিলা মতবাদে বিশ্বাস করতেন, হানাফী মাযহাব মানতেন না তারাও এই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে বিচারের রায় দিতেন।

প্রশ্ন : যদি ইসলামী আইন একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হয় তাহলে কি অমুসলিম আইন একটি অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত একজন মুসলমানের জন্যও প্রযোজ্য হবে?

উত্তর : প্রশ্নটির প্রথম অংশ সঠিক নয়। কেননা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের জন্য ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হয় না। মহানবী স.-এর যুগে কুরআনের নীতি-মালা অনুযায়ী প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় (ইহুদি, খৃস্টান এবং অন্যান্য) স্বশাসন উপভোগ করতেন। তাদের এই স্বাধীনতা যে শুধুমাত্র তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, তাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থাও এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

একটি অমুসলিম দেশে বসবাসরত একজন মুসলমান সেই দেশের প্রচলিত আইনের অধীন থাকবেন। যদি সেই রাষ্ট্র ইসলামের উদারতা ও সহনশীলতা গ্রহণ না করে এবং অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বশাসনের সুযোগ না দেয় তাহলে আমাদেরকেই সজাগ থাকতে হবে আমাদের উপর সম্ভাব্য আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলো মোকাবেলা করার জন্য– যদি আমরা সেই দেশে থাকতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হল, একজন জার্মান অথবা ফরাসী নাগরিক কি করবেন, যদি তিনি ইসলাম কবুল করেন? এটাই চরম বাস্তবতা যে, কোন দেশ তার নিজস্ব ভূমিতে অবাধ অভিবাসনের সুযোগ দেবে না। এর কোন সদুত্তর নেই। এসব জটিলতা গ্রহণ করে কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না' (২ : ২৮৬)। একজনের উচিত যতদূর সম্ভব ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা। যদি অসাধ্য কিছু হয় তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

একইভাবে একজন মুসলমানের উচিত যতদূর সম্ভব ইসলামী আইন মোতাবেক জীবন যাপন করা। যেমন ফ্রান্সে উত্তরাধিকার আইন সবার জন্য সমান। এই আইন বাইবেল, তাওরাত বা কুরআন কোনটারই অধীন নয়। এটি একটি মানব রচিত আইন, যা নির্বিশেষে একজন খৃস্টান, কম্যুনিস্ট, ইহুদি অথবা একজন মুসলমানের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। জন্মগত বা অনুমোদনসূত্রে

একজন ফরাসী নাগরিক এই আইনের অধীন। কিন্তু এর একটি সমাধান রয়েছে। ফরাসি আইনে দান বা উপহার দেয়ার সুযোগ রয়েছে। যদি আমি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ মেনে চলতে চাই তাহলে আত্মীয়দের ভিতর, যেমন স্ত্রী, পুত্র, ভাই ইত্যাদি, এদের ভিতর ইসলামী আইন মোতাবেক দান বা উপহার হিসেবে সম্পদের বণ্টন করতে পারি। আসলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

প্রশ্ন : অনুগ্রহ করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একজন আইনজীবীর দায়িত্ব ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মহানবী স.-এর যুগে কোন পেশাদার আইনজীবী (উকীল) ছিলেন না। কিন্তু কুরআনে এ প্রসঙ্গে একটি আভাস রয়েছে, 'সাবধান! তোমরা তাদের জন্য আবেদন করেছিলে; কে অবিশ্বাসীদের জন্য পুনরুত্থানের দিন আল্লাহর কাছে আবেদন করবে অথবা কে তাদের রক্ষাকারী হবে?'। সততই আমি মনে করি না যে, আইন ব্যবসা বর্তমান যুগে নিষিদ্ধের তালিকাভুক্ত হবে। কেননা সাধারণ আইন হলো এমন একটি বিষয় যেখানে কোন নিষিদ্ধ জিনিসকে অনুমোদিত বলে ঘোষণা দেয়া হয়নি। আর যদি আইনজীবী হওয়া নিষিদ্ধ না হয়, তাহলে আমাদের জন্য একটি নির্দেশ থাকত, যদিও মহানবী স.-এর আমলে এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রশ্ন : অপরাধী (ক্রিমিনাল) এবং সাধারণ (সিভিল) ক্ষেত্রে একজন আইনজীবীর দায়িত্ব কতটুকু আইনসম্মত?

উত্তর : একজন আইনজীবীর দায়িত্ব নয় যে, সে একজন চোর বা ডাকাতকে সহায়তা করবে। তার দায়িত্ব হলো তার লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে একজন গ্রাহককে সেবা দেবে। তার গ্রাহকের অধিকারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত করবে। একজন আইনজীবী বিচার সভার সামনে আইনের বিভিন্ন কৌশলগত দিকের ব্যাখ্যা দেবে। তার কাজ হবে সত্যকে উদঘাটন করা, গোপন করা নয়। তাই সে অপরাধী বা অত্যাচারীকে সহায়তা দেবে না।

প্রশ্ন : যাকাত ও উশর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রকম কর আরোপের ব্যবস্থাটা কতটুকু অনুমোদনযোগ্য, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে?

উত্তর : যদি একটি দেশের প্রয়োজন যাকাত এবং উশর দিয়ে না মেটানো যায় তাহলে কর দিয়ে আমরা আমাদেরকেই সহযোগিতা করছি এবং আমাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখছি। অন্যথায় তা আমাদের জন্যই আত্মঘাতি হবে। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, 'তোমার নিজের হাতকে তোমার মৃত্যুর জন্য প্রসারিত করো না' (২ : ১৯৭)।

প্রশ্ন : ইসলামে কি নির্বাচন এবং বর্তমান যুগের গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যে গণতন্ত্র মগজ নয় মাথা গুণে?

উত্তর : যে বিষয়টি নিষিদ্ধ নয় তাকে সাধারণত সবাই আইনসম্মত বলে মনে করে এবং গ্রহণ করে নেয়। মহানবী স.-এর যুগে মানুষ গণনার কোন রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু তা আবার নিষিদ্ধও করা হয়নি। এটা আমাদের দায়িত্ব একজন ভাল লোককে নির্বাচিত করা। যদি আমরা এমন একজনকে

নির্বাচিত করি যিনি কাজ না করে বাকচাতুর্য দিয়ে সংসদে সময় কাটান তাহলে সেই লোকটিকে দোষ না দিয়ে আমাদের নিজেদেরকেই দোষী ভাবা উচিত। সচেতনভাবেই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং একজন ভাল লোককে নির্বাচিত করা উচিত, যিনি সত্যিকার অর্থেই দেশের সেবা করবেন এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাদের চেতনার প্রতিফলন ঘটাবেন।

প্রশ্ন : একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে কি খলিফা বা আমীরুল-মু'মিনীন বলা যায়? যদি তিনি মুসলমান শাসকের গুণাবলী না ধারণ করেন তাহলেও কি তার অনুগত থাকা বাধ্যতামূলক?

উত্তর : আমি মনে করি, আমাদের নিজস্ব বিষয়গুলোর প্রতিই আমাদের বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন; অন্যদের বিষয় নিয়ে নয়, বিশেষ করে যখন তারা আমাদের পদ থেকে অনেক ওপরে। যখন একজন রাষ্ট্রপ্রধান একটি নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করেন তখন আমরা কি করতে পারি? আমাদের উচিত আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর প্রতি বেশি মনযোগী হওয়া। রাষ্ট্রপ্রধানকে কি উপাধিতে ডাকা হবে সে বিষয়ে কুরআন এবং হাদীসে কোন কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এটা পরিষ্কার যে, সমস্ত জাতির যিনি প্রধান হবেন তাঁকে খলিফা বা আমীরুল-মু'মেনিন বলে ডাকা যায়। একটি ছোট অঞ্চলের স্বাধীন শাসককে ঐতিহ্যগতভাবে খলিফা বা আমীরুল-মু'মেনিন বলা হয় না। যদি কোন রাষ্ট্রপ্রধান তার নাগরিকদের এইসব উপাধিতে তাকে ডাকতে বাধ্য করেন তাহলে তো কিছু করার নেই। এরকম অনেক দাবিদার তো থাকতেই পারে। এক দশক বা তারও আগে ইয়েমেন-এ যখন গণতন্ত্র চালু হয়নি তখন সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানকে ইমাম উপাধিতে ডাকা হয় এবং ইয়েমেনবাসীগণ তাকে খলিফা এবং আমীরুল-মু'মেনিন বলেই সম্বোধন করত। মরক্কো'র বাদশাহ এখনো এইসব খেতাবই ব্যবহার করেন যদিও তা তাদের দেশের বাইরে স্বীকৃত নয়।

প্রশ্ন : আধুনিক গণতন্ত্র কি ইসলামের মানদণ্ড পূরণ করতে পারে? যদি তা ইসলামী ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে এই ব্যবস্থায় কি ধরনের পরিবর্তন আনা যেতে পারে, যেহেতু ইসলাম একজন শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষকে একইভাবে মূল্যায়ন করে না?

উত্তর : ইসলামে সরকার গঠনের কোন বাঁধাধরা রূপরেখা নেই। আমার মতে, মহানবী স. সুচিন্তিতভাবেই তাঁর উত্তরসূরিদের এই বিষয়ে একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়া থেকে বিরত ছিলেন। সরকার গঠনের বিষয়ে ইসলাম প্রতিটি জনগোষ্ঠী ও দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও সময়ের চাহিদার ওপর ন্যস্ত করেছে। জনগণের পসন্দের ওপর সরকারের রূপরেখা নির্ভর করবে। যখন তা ফলপ্রসূ হবে তখন তারা তা পরিবর্তন করবে। বিপরীতে এটাও বলা যায়, মহানবী যদি স. রাজতন্ত্র অথবা অন্য কোন রকম সরকার পদ্ধতির পক্ষে মতামত দিতেন তাহলে তা পালন করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। তাই মহানবী স. তাঁর লোকজনের ওপর কোনরূপ সীমারেখা টেনে দেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র অথবা অন্য যে কোন রকম সরকার পদ্ধতি মেনে নিতে পারি যেখানে শাসকগণ আল্লাহভীরু হবেন এবং এটা শুধু তাদেরই কর্তব্য নয়, আমাদেরও কর্তব্য। একদিন খলিফা মামুনকে এক লোক জটিল প্রশ্ন

করেছিলেন, উমর রা.-এর শাসনামলের বিপরীত অনেক কিছু করা হয়েছে। মামুন নম্রভাবে উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমিও তাই করতাম যদি উমরের শাসনকালের লোকদের মত লোক পেতাম'।

প্রশ্ন : ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আবেদনের কোন সুযোগ রয়েছে কি?

উত্তর : মহানবী স.-এর সময়ে এরকম কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে যদি কোন লোক কাজী'র বিচারে সন্তুষ্ট না হতেন তাহলে খলিফা'র কাছে এসে পুনরায় বিচার প্রার্থনা করতে পারতেন এবং খলিফা পুনরায় বিষয়টি শুনে সেই ভিত্তিতে রায় দিতেন।

খলিফা মামুনের আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল। একদিন এক গ্রামীণ জনপদ থেকে কিছু লোক এসে খলিফা'র জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা তাদের স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। খলিফা'কে দেখে মনে হল, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং বললেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে গভর্নরের ন্যায় বিচার সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি বুঝতে পারলেন না, কিভাবে এই অভিযোগকারীদের সেবা করবেন। একজন বৃদ্ধ কৃষক সাহস করে সামনে এগিয়ে এসে করজোরে বললেন, 'যদি তিনি সত্যিই ন্যায়বিচারক হন তাহলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁর সম্মানহানি করতে চাই না এবং তাঁকে আমাদের জাতির জন্য খুবই প্রয়োজন। তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে পুরো জাতির মাঝে বিলিয়ে দেয়া হোক।' এই কথায় খলিফা হাসলেন এবং সেই শাসককে বরখাস্ত করলেন।

প্রশ্ন : একটি পুরাতন ইজমা কি নতুন একটি ইজমা দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে এবং এর কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ নযীর নেই। সম্ভবত এটি একটি ব্যবস্থা যা অনেক সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। একটি ইজমায় পরিবর্তন অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। আপনি কি মনে করেন, যারা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখান করেন, তারা সঠিক?

উত্তর : আপনি সম্ভবত সঠিক কথাই বলেছেন। তবে আপনাকে এটা করতে হবে একথা আমি বলতে চাই না। বস্তুত আমি যা বলতে চাই তা হলো, হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত বিচারক সেই প্রাথমিক যুগের একটি নীতিমালার রূপরেখা তৈরি করে বলেছিলেন, এটি পরিবর্তিত হতে পারে। বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে যখন লোকজন কুরআন ও হাদীসে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাবে না তখন তারা স্বভাবতই তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টামত নতুন নতুন পথের সন্ধান করবে। অন্যরা তাদের প্রস্তাবে রাজি হবে আর ইজমা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে সবার জন্য। কিন্তু সেই চুক্তির মাধ্যমে যে আইন হবে সেটি হবে একটি মানব রচিত আইন; সেখানে থাকবে না কোন ইলাহী নির্দেশ, এমনকি থাকবে না মহানবী স.-এর কোন মতামত। পরবর্তী কালে, সম-পদমর্যাদার লোকজন তাদের নিজেদের কথা ভেবে নিজেদের সময়োপযোগী আইন তৈরি করবে। যদি অন্যরা সেই আইনটি মেনে নেয় তাহলে পুরনো ইজমার স্থলে একটি নতুন ইজমা হিসেবে তা গণ্য হবে। সবাই সেই নতুন ইজমার ভিত্তিতে কাজ করবে। এটা বলা মুশকিল যে, নতুন ইজমা কোনরকম সমস্যার সৃষ্টি করবে কিনা। আমার মতে, যদি ইজমার ভিত্তিতে একটি পুরনো ও অকার্যকর আইনকে আবার চালু

করা হয় তাহলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে। এটি পরিবর্তন করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই এবং ইজমার ভিত্তিতে একটি নতুন আইন তৈরি করতে হবে। ভুলে যাবেন না, একটি নামমাত্র ইজমাই যথেষ্ট নয়। এর একটি প্রমাণ প্রয়োজন এবং এটি তৈরি করা সহজ নয়।

প্রশ্ন : মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় মুয়ায ইবনে জাবাল রা. তাঁর কারণগুলো প্রদর্শন করেছিলেন যখন কুরআন সম্পূর্ণরূপে নাযিল হয়নি এবং দীন ইসলামও পরিপূর্ণ রূপ পায়নি। তাহলে কি কুরআন এবং দীন পরিপূর্ণতা লাভ করার পর এটি অনুমতি পেয়েছে?

উত্তর : নবম হিজরীতে যখন এই ঘটনাটি ঘটে তখন কুরআন পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়নি, তবে আশি বা নব্বইভাগ নাযিল হয়েছিল। এই বিষয়টি হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই সময়টিতে যদি কেউ এই দু'টি উৎস থেকে প্রয়োজনীয় উত্তর না পেতেন তাহলে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হত। পরিপূর্ণ কুরআন নাযিল হওয়ার পর এই অনুমতি প্রয়োগ করা হবে। যদি একজন কাজী, মুফতী বা আইন বিষয়ে আলেম ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস থেকে কোন সমাধান খুঁজে না পান তাহলে মহানবী স. সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেছেন। তখন আমরা ইজতিহাদের আশ্রয় নেব। সেই পদ্ধতি মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর রহমত পাবো। আল্লাহর রহমতে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। মহানবী স. বলেন, 'হে মহান আল্লাহ! আমি খুশি তোমার দূতের সিদ্ধান্তের দ্বারা।' এই অনুমতি আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় এবং আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী স.-এর মাধ্যমে আমাদের জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাতে আমাদের খুশি হওয়া উচিত। এটা পরিষ্কার যে, ইজতিহাদ প্রয়োজনীয় নয় যদি আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান কুরআন এবং হাদীসের ভিতর আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু যখন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত পাওয়া যাবে আলেমগণ তাদের বিচার-বুদ্ধি মোতাবেক বিভিন্নভাবে সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে পারেন। এজন্যই মহানবী স. আমর ইবনুল আস রা.-এর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, যদি একজন মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তাহলে আল্লাহ তার প্রচেষ্টার জন্য তাকে পুরস্কৃত করবেন।

অনুবাদঃ রবাব রসা

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ৭৫-৮৮

মীরাসী আইন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

জাফর আহমাদ

ভূমিকা

ইসলাম শুধু গোটা মানব জাতির একমাত্র কল্যাণমূলক ধর্মই নয়, বরং দুনিয়া ও আখেরাতের এক বাস্তব সমন্বয় সাধনের নাম ইসলাম। একটি জীবনের দু'টি অধ্যায়। একটি অপরটির পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটির সফলতা আশা করা এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ইচ্ছা করলেই মানুষ দুনিয়ার জীবন থেকে এক লাফে আখেরাতে পৌছে যেতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীনই আমাদেরকে মোনাজাতের মাধ্যমে এ শিক্ষাই দিয়েছেন, 'হে আমার রব! তুমি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর' (সূরা বাকারা : ২০১)। আখেরাতের সফলতা দুনিয়ার কার্যকলাপের ওপর নির্ভরশীল।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে সকল ক্ষেত্রেই যেহেতু ইসলামের সরব পদচারণা রয়েছে তাই মীরাস বণ্টনেও তা একটি সুষম নীতি প্রণয়ন করেছে। ধন-সম্পদের ব্যাপারে প্রাথমিক বা মৌলিক কথা হলো এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন। 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন' (সূরা বাকারা ২৮৪)। দ্বিতীয়ত, মানুষ কেবলমাত্র বৈধ ভোগ-ব্যবহারের অনুমতিসহ এর আমানতদার বা ট্রাস্টি মাত্র। যেহেতু সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তাই তিনিই একমাত্র এর বণ্টনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করার অধিকার রাখে না। কারণ মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত আইনের আওতাধীন বণ্টন ব্যবস্থা কখনো ন্যায়-ইনসাফ ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি ন্যায়বান। নবী করিম স. বলেছেন: 'ধন-সম্পদকে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বণ্টন কর (মুসলিম)। মহান আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার ৭, ১১-১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতসমূহে মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উত্তরাধিকার ও তাদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ইসলামী অনুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামের অন্যান্য বিভাগ ও বিষয়ের ন্যায় মীরাস বণ্টনে ইসলামী আইন, সুষম বণ্টন নীতি ও নির্দেশনা আমরা সকলেই বেমালুম ভুলতে বসেছি। সারা বিশ্বব্যাপী মানব রচিত মতবাদ, বিশেষত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মত দুই প্রান্তিক মতবাদের জোয়ারে গা

লেখক : প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

ভাসিয়ে দিয়ে আমরা আল্লাহর আইনকে দুর্বিষহ, অবিচার ও অমানবিক আখ্যা দিয়েছি। অপরিণামদর্শী কিছু মুসলিম দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে আল্লাহর আইনকে আমরা পরিবর্তন করার মত স্পর্ধাও প্রদর্শন করেছি।

ফারায়েযের সংগা

ফারায়েয ও মীরাস শব্দ দু'টি আরবী। ফারায়েয শব্দটি 'ফরয'-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো নির্ধারিত বিষয়, অবশ্য করণীয়, নির্দিষ্ট অংশ, পরিমাণ। মীরাস শব্দটি একবচন, অর্থ- উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। পরিভাষায় ইসলামী আইন ও হিসাব শাস্ত্রের এমন কিছু নিয়ম-কানুন ও সূত্রাবলী যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

মীরাসী আইনের গুরুত্ব

ইসলামে মীরাসী আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন মান্য করে চললে দুনিয়ায় অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যদিকে আখেরাতেও পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য" (সূরা নিসা : ১৩)।

ইসলামে সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণের যে কয়টি প্রক্রিয়া আছে তন্মধ্যে মীরাস বন্টন একটি বিশেষ ও অন্যতম প্রক্রিয়া। এ আইনের মাধ্যমে ধন-সম্পদ একত্র হয়, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তা নানাভাবে খণ্ড-বিখণ্ড ও বিভক্ত হয়ে অসংখ্য হস্তে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ইসলামী অর্থনীতিতে ধন-সম্পত্তির এ রূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার বিধানকে বলা হয় 'মীরাসী আইন'। ব্যক্তির নিজের জীবনে যেসব লোকের সাথে তার বৈবাহিক কিংবা আত্মিক অথবা রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তার মালিকানায় ধন-সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর ঐসব লোকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে বণ্টিত হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : 'উত্তরাধিকার আইন নিজেরা শিখ, মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ এটা ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞানের অর্ধেক' (তিরমিযি, ইবনে মাজা)। পাশ্চাত্যের এক আইনজ্ঞ লিখেছেন, 'আধুনিক সভ্য পৃথিবী ধনবন্টনের যত নিয়ম ও পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল। এ আইনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও নিখুঁত, সামঞ্জস্য অপরিসীম।' অন্য এক পাশ্চাত্য অধ্যাপক লিখেছেন, 'ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একমাত্র এ ব্যবস্থাই ধনী ও নিঃস্বের মধ্যে চিরন্তনী ব্যবধান দূরীভূত করতে পারে।'

মীরাসী আইনের মূলনীতি

ইসলামে মীরাসী আইনের মূলনীতি নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে : 'মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন যে ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর নারীদেরও অংশ রয়েছে সে ধন-

সম্পদে যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে যায়, তা সামান্য হোক বা বেশি এবং এক নির্ধারিত অংশ' (সূরা নিসা : ৭)। এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশনা বা মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এক. মীরাস কেবল পুরুষদের নয়, নারীদের জন্যও সংরক্ষিত। দুই. যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যি বণ্টিত হতে হবে। এমনকি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা। তিন. মীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য যে কোন ধরনের হালাল সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জারী হবে। চার. মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন কোন ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়। পাঁচ. নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম আত্মীয় মীরাস লাভ করবে না।

যারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে

তিন ব্যক্তি মীরাস হতে বঞ্চিত হয় : (ক) হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস লাভ করতে পারবে না। নবী করিম স. বলেছেন : 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মীরাস লাভ করতে পারবে না' (ইবনে মাজা)। (খ) ধর্মের ভিন্নতার দরুন একজন অপরজনের মীরাস হতে বঞ্চিত হবে। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে থেকে জানা যায়, 'মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের এবং কাফের ব্যক্তি মুসলিমের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। ইমাম নববী বলেন, 'মুরতাদ মুসলমানের অংশীদার হবে না, এতে সকল ইসলামী বিশেষজ্ঞ একমত। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে, মুরতাদ ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা তার মুসলিম উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং মুরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা বাইতুল মালে জমা হবে (গ) দেশ বা রাজ্যের ভিন্নতার কারণেও ক্ষেত্রবিশেষ মীরাস লাভ করতে পারে না।

মীরাস বণ্টন-পূর্ব কাজ

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর তার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে নিম্নলিখিত দাবিগুলো সর্বাগ্রে আদায় করতে হবে। প্রথমত, অপচয় ও কার্পণ্য পরিহ-ার করে মধ্যম পন্থায় কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। দ্বিতীয়ত, ওসিয়তের পূর্বে সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমে অন্যান্য ঋণের মতই স্ত্রীর মোহরানা বাকি থাকলে তা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি সমস্ত সম্পদ ব্যয় হলেও তা করতে হবে। তৃতীয়ত, উল্লেখিত দু'টির পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূর্ণ করা হবে। আর অবশ্যই তা এক-তৃতীয়াংশের অধিক হবে না। এ তিনটি কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ইসলামী আইন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে যাবিল ফুরূজ (অংশীদার) আসাবা (অবশিষ্টাংশ ভোগী) ও যাবিল আরহামের (দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন) মধ্যে বণ্টিত হবে।

উত্তরাধিকারীদের প্রকারভেদ

যাবিল ফুরূজ বা আসহাবুল ফারায়েয : নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ। যাদের অংশ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এরা মোট ১২ জন। ৪ জন পুরুষ যথা : (১) পিতা, (২) প্রকৃত দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা প্রপিতামহ যতই ওপরে থাকুক না কেন, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) সহোদর বোন, (৫) বৈপিত্রেয় বোন, (৬) ভাইপো এবং তার সন্তান, (৭) মাতা ও (৮) দাদী-নানী।

আসাবা : এমন সব উত্তরাধিকারী, যারা যাবিল ফুরূজের অংশ গ্রহণ করার পর অবশিষ্টাংশ সম্পদের হকদার হয়। আসাবা দুই প্রকারের হয়। রক্ত সম্পর্কীয় আসাবা ও কারণগত আসাবা। আসাবা গণ্য করা হয় (১) পুত্র, (২) পুত্রের পুত্র ও তার অধস্তন পুরুষ, (৩) পিতা, (৪) পিতামহ ও তার উর্ধ্বতন পুরুষ, (৫) ভাই, (৬) ভাইপো এবং তার সন্তান, (৭) চাচা এবং তার সন্তান, (৮) ফুফু, (৯) ভগ্নি ও (১০) কন্যাকে।

যাবিল আরহাম : যাবিল ফুরূজ ও আসাবা-এর অবর্তমানে যারা বংশগত সম্পর্কের আত্মীয় বা নিকট আত্মীয় তাদেরকে যাবিল আরহাম বলা হয়। যাবিল আরহাম ১২ জনের ওপরে হয় না। তারা হলো : (১) কন্যার সন্তানগণ, (২) পুত্র দুহিতার সন্তানগণ, (৩) ওয়ারিশী দাবি থেকে বাদ পড়া দাদাগণ, (৪) ওয়ারিশী দাবি থেকে বাদ পড়া দাদীগণ, (৫) আপন বোনের সন্তানগণ, (৬) বৈমাত্রেয় বোনের সন্তানগণ, (৭) বৈপিত্রেয় বোনের সন্তানগণ, (৮) ভাগিনীগণ, (৯) ফুফু ও তার সন্তানগণ, (১০) চাচার সন্তানগণ, (১১) মামা ও তার সন্তানগণ এবং (১২) খালা ও তার সন্তানগণ।

আল-কুরআনে বর্ণিত অংশসমূহ

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে ছয়টি অংশ নির্ধারণ করেছেন। যেমনঃ অর্ধাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ, এক-তৃতীয়াংশ ও এক-ষষ্ঠাংশ। এ কয়টি হারেই সম্পদ উল্লেখিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। বিভিন্ন কারণে উত্তরাধিকারীদের অংশের তারতম্য ঘটলেও এ ছয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন সূরা নিসার ১১-১২ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র দুই কন্যার অংশের সমান পাবে, আর যদি কন্যা দুইয়ের অধিক হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে, একমাত্র কন্যা হলে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা (প্রত্যেকে) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে মাতার প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাইবোন থাকে, তাহলে মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।'

'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এটা তারা যে অসিয়ত করে যায় তা আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ সকল তোমাদের কৃত অসিয়ত আদায় করার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি

কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তারা যদি তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে তারা সকলে একত্রে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এটা কৃত অসিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। এ শর্তে যে, কারো ক্ষতি না করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।'

'(হে নবী) লোকেরা আপনাকে (উত্তরাধিকারের) বিধান জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকার হবে, যদি তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দু'জন হয়, তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দু'জন নারীর অংশের সমান। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও এজন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত' (সূরা নিসা ১৭৬)।

মীরাসী আইনের কিছু সম্পূরক নীতি

'আওল নীতি : আওল শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি হওয়া বা সীমা অতিক্রম করা। ফারায়েযের পরিভাষায় যাবিল ফুরূজদের (যাদের অংশ আল্লাহ্ তাআলার কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে) অংশ প্রদানের পর তাদের প্রদত্ত অংশাবলীর যোগফল যদি মূল সংখ্যা হতে অধিক হয় তখন তাকে আওল বলে। কখনো কখনো যাবিল ফুরূজদের মধ্যে তাদের নির্ধারিত অংশ বন্টন করা হলে তাদের অংশের পরিমাণ মূল সংখ্যা তথা মোট সম্পত্তি হতে বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে যদি মূল সংখ্যাকে ধরে সম্পত্তি বন্টন করা হয় তাহলে কেউ তার নির্ধারিত অংশ পাবে আবার কেউ পাবে না। এটি একটি জটিল সমস্যা। এর সমাধান হলো, মূল সংখ্যাকে পরিবর্তন করে ওয়ারিসগণের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী বাড়িয়ে সম্পদ বন্টন করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার নামই 'আওল।

রদ্দ নীতি : রদ্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা। ফারায়েযের পরিভাষায় যাবিল ফুরূজদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এবং মৃত ব্যক্তির কোন আসাবা না থাকে তাহলে অবশিষ্ট সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য যাবিল ফুরূজদের নিকট তাদের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী প্রত্যাবর্তনের এ নীতিকে রদ্দ বলা হয়।

তাসহীহ্ নীতি : মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ বন্টনের সময় যদি একই শ্রেণীর একাধিক উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশের সৃষ্টি হয় তাহলে যে সকল নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভগ্নাংশ ছাড়াই প্রত্যক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ তাদের সংখ্যা অনুযায়ী সমভাবে পূর্ণ সংখ্যার দ্বারা বন্টন করা যায় তাকে ফারায়েযের পরিভাষায় তাসহীহ বলা হয়।

মুনাসাখা : মুনাসাখা এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর করা। ফারায়েযের পরিভাষায় কোন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার পূর্বেই যদি কোন উত্তরাধিকারীর

মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার প্রাপ্য অংশ তার উত্তরাধিকারীর মধ্যে বন্টন হওয়াকে মুনাসাখা বলে। এ ক্ষেত্রে প্রথমত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ফারায়েয করতে হবে। এতে দ্বিতীয় মৃতকে অংশ দিতে হবে এবং প্রাপ্য অংশ তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ফারায়েয অনুযায়ী বন্টিত হবে।

১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন

ইসলামের মীরাসী আইনানুসারে নীতি সরাসরি তাদের পিতামহের সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে না, বরং তাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে অংশীদার হতে পারে। কিন্তু পিতা কিংবা মাতা যদি উপরোক্ত ব্যক্তিগণের পূর্বেই মারা যায়, তবে মাঝখানের সূত্র ছিন্ন হওয়ার দরুন তারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। (এখানে 'পিতামহ' পরিভাষায় পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহী এবং 'নাতি' পরিষ-ভার দৌহিত্র, দোহিত্রী, পৌত্র ও পৌত্রী অন্তর্ভুক্ত)। যারা অজ্ঞ বা ইসলাম বিদ্বেষী তারা এটিকে অমানবিক বলে অভিহিত করে, যার দরুন এরা যুগে যুগে এ আইনটি পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৬১ সনের 'মুসলিম পারিবারিক আইনটি' এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্র ও পৌত্রীকে তাদের পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশে এ আইনটি তখন থেকেই বলবৎ আছে। এ আইনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে, 'যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তার কোন পুত্র বা কন্যা স্বীয় সন্তান রেখে মারা যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনকালে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে।' প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর আইনের গভীরে প্রবেশ করেনি এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বুঝেনি। একজন ছেলে বা মেয়ে পিতা বা মাতার বর্তমানেই যদি মারা যায়, তবে পিতা বা মাতার সম্পদে সে তো অংশীদারই হলো না, তাহলে তৎসংশ্লিষ্টরা পাবে কি করে? বরং না পাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ পৌত্র-পৌত্রী এবং দাদা-দাদীর মাঝের মূলসূত্র হলো পিতা। মাঝের সূত্র যদি মীরাস বন্টনের আগেই ছেদ হয়ে যায় এবং এরপরও মীরাসের ব্যবস্থা রাখা হয়, তবে এ ধরনের মীরাসের যুক্তিসঙ্গত দাবী নিয়ে আরো অনেকেই এগিয়ে আসতে পারে। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীও সংগতভাবেই দাবি তোলতে পারে। এর ফলে মীরাসের দীর্ঘসূত্রিতা শুরু হবে। মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতায় যদি পৌত্র-পৌত্রীকে মীরাস দিতে হয়, তাহলে অন্যান্য সম্পর্কের আত্মীয়রা এ থেকে বঞ্চিত হবে কেন? প্রকতৃপক্ষে মীরাসী আইনে সম্পর্কের আত্মীয় উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভের মানদণ্ড নয়। প্রকৃত মানদণ্ড হলো নিকটতম আত্মীয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যি সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন' (সূরা নিসা : ১১)।

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের গভীরতা উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহর এ

আইনের ত্রুটি দূর করতে চায় তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষ আল্লাহ্ তাআলারই সৃষ্টি, সুতরাং তাঁরই ভালো জানা আছে কিসে মানুষের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ। তাই আল্লাহ তাআলা যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। এতে মানুষের হাত দেয়া উচিত নয়। কারণ কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর হাতে। এ আইনে হাত দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট সীমা লংঘন করা। এ সমস্ত লোকদের আল্লাহর এক মারাত্মক ও অত্যন্ত ভীতি প্রদর্শনকারী আয়াতের সংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে, আল্লাহ্ তাকে আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক শাস্তি' (সূরা নিসা ঃ ১৩-১৪)।

নাতি ও নাতনীর তাদের দাদার জীবিতাবস্থায় পিতার মৃত্যু ঘটলেও তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন তা সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে দেয়া হলো :

মীরাস এবং মানবিকতা দু'টি ভিন্ন বিষয়। প্রথমত মীরাস, এরপর মানবিকতা। তদুপরি মীরাস বণ্টনের সময় মানবিক দিক বিবেচনার জন্য তো আল্লাহ্ তাআলার আলাদা নির্দেশই রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো' (সূরা নিসা : ৮)। এ ধরনের ঘটনা জীবিত মানুষদের জন্য একটি পরীক্ষাও বটে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ দেখতে চান মানুষ মানুষের জন্য কতটুকু এগিয়ে আসে। মানুষের মানবিক গুণকে উজ্জীবিত করার জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

তাছাড়া নাতি ও নাতনী সম্পর্কের আত্মীয়দের জন্য আল্লাহ্ তাআলা ওসিয়তের ব্যবস্থা রেখেছেন। আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অসিয়ত পূর্ণ করার পর মীরাস বণ্টনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, '(এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) অসিয়ত পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা পরিশোধ করার পর' (সূরা নিসা : ১১)।

কোন কারণে অসিয়ত করা না গেলেও সম্পত্তি বণ্টনের সময় তাদেরকে দিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। 'মীরাস বণ্টনের সময় নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন যারা মীরাসের নিয়মে অংশ পায়নি, তারা যদি উপস্থিত থাকে, তাদেরকে তা থেকে জীবিকা দাও এবং তাদেরকে ভাল কথা বলো' (সূরা নিসা : ৮)।

এরপরও যদি কোনরূপ ব্যবস্থা না হয়, তার দায়িত্ব নিবে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার। সরকারী কোষাগার থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আমাদের সরকারগুলো তা না করে আল্লাহর আইনে হাত দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এটি একটি সম্পূর্ণ আল্লাদ্রোহিতা, আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও সীমালংঘন বলে বিবেচিত হবে।

নারী অধিকার ও মীরাস

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ দেয়া হয়েছে– এটিও একটি স্থূলজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিযোগ। যারা এ ধরনের অভিযোগ করেন তাদেরকে জাহেলিয়াতের নারী এবং ইসলামে নারীর অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করার অনুরোধ করবো। বরং পাশ্চাত্যবাদী বা নারীবাদীরাই নারীকে পণ্যের মতই ভোগের সামগ্রী মনে করে, আবার নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে সারা পৃথিবী জুড়ে জিগির তোলে। এরা নারীর মর্যাদাকে সর্বাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীদের অধিক সম্মানিত করেছে। মহানবী স. ঘোষণা করেছেন : 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।' যে কন্যা সন্তানকে কুলক্ষুণে বা মর্যাদাহানীকর মনে করা হতো এবং মেয়েদের জীবিত কবর দেয়া হতো, সেই অবহেলিত মেয়েদের লালন-পালনকে আল্লাহর রসূল জান্নাত পাওয়ার উপায় বলেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা বা দু'টি বোন থাকবে, আর সে তাদের প্রতি যত্নশীল হবে, তাদের হক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে, তার জন্য বেহেশত অনিবার্য, (তিরমিযি, আবু দাউদ)। নারীর অমর্যাদা মানে মায়ের অমর্যাদা। কবি বলেছেন, 'নারী যেথা ছিল দাসী, তুমি তারে করে দিলে রাণী, বসাইলে একাসনে পুরুষের পাশাপাশি আনি।'

ইসলাম মৃত ব্যক্তির কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মাতাকে উত্তরাধিকারী করেছে এবং কোন অবস্থাতেই তাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করেনি। বরং অন্যান্য ধর্ম বা মতাদর্শে নারীদের অধিকারকে বরাবরই খর্ব করা হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দিকে তাকালে নারীদের করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই। ইসলামে নারীদের হক সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিন্তা করে দেখুন :

০ নারীরা বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ পেয়ে থাকে। প্রথমত, নারী স্বামীর নিকট থেকে মোহরানা পায়, নারী পিতার সম্পদের অংশ পায়, স্বামীর ও ছেলের সম্পদের ভাগ পায়। সুতরাং ইসলাম নারীদের ঠকায়নি, বরং একাধিক মীরাসী সম্পদে অধিকার দিয়ে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

০ আল-কুরআনে নারীর অংশ নির্ধারিত করে তাদেরকে আরো সম্মানিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যাবিল ফুরূজের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। যাবিল ফুরূজ হলো, যাদের অংশ আল-কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্টাংশ অন্যদের মধ্যে বন্টিত হবে।

০ আল-কুরআনে যাদের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে, যাদেরকে যাবিল ফুরূজ বলা হয়, তারা মোট ১২ জন। এ ১২ জনের মধ্যে ৪ জন মাত্র পুরুষ এবং বাকি ৮ জনই মহিলা। অর্থাৎ নারীরা পুরুষের দ্বিগুণ।

০ যেহেতু পারিবারিক জীবনে শরীয়ত পুরুষদের ওপর দিয়েছে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব এবং নারীদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাই পুরুষদের তুলনায় পরিত্যক্ত সম্পদে মেয়েদের অংশ অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান। পুরুষকে এক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তাই বলে পুরুষ এ মর্যাদার অপব্যবহার করতে পারবে

না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'তোমরা এমন কোন মর্যাদার লালসা করো না, যদ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। পুরুষদের জন্য তাদের উপার্জনের অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য তাদের উপার্জনের অংশ রয়েছে' (সূরা নিসা : ৩২)

০ সর্বোপরি নারী যা পাবে তা তার স্থায়ী সম্পদ হিসেবে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। তার সম্পদ সংসারে ব্যয় করার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পক্ষান্তরে পুরুষদের ওপর স্ত্রী, সন্তান ও অক্ষম পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

০ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমে অন্যান্য ঋণের মতই স্ত্রীর মোহরানা বাকি থাকলে তা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে, এমনকি সমস্ত সম্পদ ব্যয় হলেও তা করতে হবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থা

নিম্নে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সামান্য কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

০ মিতক্ষরা আইনে (মিতক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকার ঋষি যাজ্ঞবল্কের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলিত নিবন্ধ। এ পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার সম্পত্তি হতে অংশ পায় না। এ আইনের আওতায় কন্যার না পাবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, কারণ উল্লেখিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বেঁচে থাকে।

০ তদ্রূপ দায়ভাগ আইনেও (দায়ভাগ আইন জীমূতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের হিন্দু সমাজে এ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্য পিণ্ডদান শর্ত। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবী সূত্র স্বীকার করে না।) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। কন্যাকে যদিও সপিণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের অংশ পাবার তেমন সম্ভাবনা নেই।

০ দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিসগণ জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না। অন্যান্য ওয়ারিসগণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও, যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না।

০ মিতক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না। তাছাড়া দায়ভাগ আইনের ন্যায় যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না।

বৌদ্ধ আইন

বৌদ্ধদের আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকলেও হিন্দুদের দায়ভাগ আইন তাদের মধ্যে প্রচলিত। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ছাড়া অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দু দায়ভাগ আইন

দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। Principal of Hindu Law-এ বলা হয়েছে 'Hindu Law applies(iv) to Jaina, Buddhists in India Sikhs except so far as such law is varied by custom.'

খৃস্টান আইন

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খৃস্টানদের জন্য আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বরং ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের (Act 39 of 1925) ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ খৃস্টানদের জন্য প্রযোজ্য। এদের আইনে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, স্বামী-স্ত্রী নয় এমন দু'জনের মিলনে যে সন্তান জন্মলাভ করবে সে অংশ পাবে না। এখানে নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকে বৈধ করা হয়েছে, জারজ সন্তানকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ শাস্তি দেয়া উচিত ছিল তাদের যাদের অবৈধ মিলনে এ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

অসিয়ত

অসিয়তের প্রভিশন মূলত এমন অনেক নিকট আত্মীয়ের জন্য যারা আইনগত বা বিশেষ কোন কারণে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অসিয়ত সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক কার্যকর হবে না। যদি কেউ এর অধিক করেন, তবুও এক-তৃতীয়াংশই বৈধ এবং কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ সমঝোতার ভিত্তিতে অসিয়তের এক-তৃতীয়াংশ কার্যকর করতে পারবেন। যেমন- 'হযরত সা'দ রা. রোগাক্রান্ত হলে রসূলুল্লাহকে স. বললেন, আমার অঢেল সম্পদ রয়েছে, আমার একটিমাত্র মেয়ে আছে। আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ অসিয়ত করতে পারি? রসূলুল্লাহ বললেন : না। তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন : না। তাহলে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হাঁ, এক-তৃতীয়াংশও অনেক।'

ইসলামী অর্থনীতিতে অসিয়ত কেবল একটি সুপারিশই নয়, বরং এটা অনিবার্যরূপে কার্যকর করতে হবে। কুরআন মজিদে অসিয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা মুত্তাকীদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে ধার্য করা একটি অনিবার্য কর্তব্যবিশেষ। ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : কোন মুসলমানের কাছে অসিয়ত করার মত কিছু থাকলে তার নিজের কাছে অসিয়তনামা লিখে না রেখে দুই রাত অতিবাহিত করার অধিকারও তার নেই (বুখারী-মুসলিম)। অসিয়ত যথাযথরূপে আদায় করা হলে পিতামহ কিংবা মাতামহ বর্তমানে যাদের পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়, তাদের মীরাস হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে কোনরূপ অসুবিধায় পড়ার কথা নয় এবং তা নিয়ে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করাও চলে না। এদের বেলায় অন্যান্য সম্ভাব্য ওয়ারিসের সম্মতিতে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি অসিয়ত করা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজ ও সভ্যতায় অসিয়ত প্রায় উঠে গিয়েছে। সমাজের কোথাও তা তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। বরং অসিয়তের জায়গা দখল করেছে জীবিতাবস্থায় মীরাস বন্টন। অথচ জীবিতাবস্থায় একমাত্র অসিয়তই করা যায়। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে জীবিতাবস্থায়

মীরাস বণ্টন নয়, বরং অসিয়ত করা যায়। কারণ উত্তরাধিকার কারো জীবিতাবস্থায় হয় না। উত্তরাধিকার বলতে বুঝায় একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যের অধিকার লাভ।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনে নির্ধারিত কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত করা যাবে না। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দেয়ার নীতি বলে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত করা যাবে না।'

মীরাসী আইনের প্রতি অবহেলা : আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মীরাস বণ্টনে প্রচুর অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, লোভ-লালসা এতটাই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, লোকজনের মধ্যে এখন আর আল্লাহর ভয় ততোটা নেই। দ্বিতীয়ত, মীরাসী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা। নিম্নে এ ধরনের কিছু অনিয়ম উল্লেখ করা হলো :

১. প্রায়শই দেখা যায়, কোন ব্যক্তি জীবিত থাকতেই বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে, হজ্জে গমনকালে, বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছলে অথবা অধিক ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ করার নিমিত্ত সম্পত্তি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এটি ঠিক নয়। কারণ উত্তরাধিকার কারো জীবিতাবস্থায় হয় না। উত্তরাধিকার বলতে বুঝায় একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যের অধিকার লাভ। যাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হলো, কোন কারণে সেই ব্যক্তিটি তার উত্তরাধিকারী নাও হতে পারে অথবা উত্তরাধিকারী হলেও কোন কারণে হয়ত বা তার অংশের তারতম্য ঘটতে পারে। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন মীরাসের অংশগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, প্রতিটি অংশ উত্তরাধিকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজনের অংশে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তাছাড়া বিশেষ কোন কার্যকারণেও মীরাসের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কোন কোন সময় দেখা যায়, অতি ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আদরের সন্তানকে ধন-সম্পদ লিখে দেয়। অবশেষে নিজেকে অন্যের অনুগ্রহ বা কৃপার পাত্র হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার এমন অপাত্রে ধন-সম্পদ তুলে দেয়া হয় যে, পাত্রটি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অসামাজিক কাজে সম্পদ ব্যয় করে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। সুতরাং জীবিতাবস্থায় সম্পদ বণ্টন করা ঠিক নয়। জীবিতাবস্থায় শুধুমাত্র অসিয়ত করা যায়। তবে এ অসিয়ত আল-কুরআনে বর্ণিত বা নির্ধারিত উত্তরাধিকারীদের কারো জন্য করা বৈধ নয়।

২. অসিয়ত তো আমাদের সমাজে বিলুপ্তপ্রায়। সামান্য যা আছে তাতেও বাড়াবাড়ির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়তের হুকুম থাকা সত্ত্বেও অন্যের হক নষ্ট করার জন্য নির্ধারিত অংশের বেশি ওসীয়ত করে। অথবা যে ব্যক্তির সন্তানাদি নেই, মা-বাপও নেই, যাকে কালালাহ বলা হয়, সে দূরবর্তী আত্মীয়ের হক নষ্ট করার জন্য সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। সম্পদ অন্যেরা নিয়ে যাবে এ ভয়ে ভাই অথবা বোনের ছেলেকে এনে লালন-পালন করে পুরো সম্পদ তার নামে লিখে দেয়। এ ধরনের ক্ষতিকারক বিষয়কে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অন্য একটি হাদীসে নবী স. বলেছেন, মানুষ তার সারা জীবন জান্নাতবাসীদের মতো কাজ করতে থাকে কিন্তু মরার সময় ওসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতি করার ব্যবস্থা করে নিজের জীবনের

আমলনামাকে এমন কাজের মাধ্যমে শেষ করে যায়, যা তাকে জাহান্নামের অধিকারী করে দেয়। রসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন : 'কোন পুরুষ বা নারী ষাট বছরব্যাপী আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করে অতঃপর মৃত্যুর সমমুখীন হয় এবং ওসীয়তের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে জাহান্নাম তার জন্য অনিবার্য হয়ে যায়' (তিরমিযি, আবু দাউদ)।

৩. অনেকে আবার কন্যা স্বামীর বাড়িতে ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে, এ ভয়ে জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পদ ছেলেদের নামে দলিলপত্র করে দেয় অথবা মেয়েদের সামান্য কিছু দিয়ে কোনক্রমে বিদায় করে দেয়া হয়। এটিও একটি মারাত্মক অন্যায় ও ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট লংঘন। তাছাড়া এটি জাহিলী যুগের একটি প্রথা। জাহিলী যুগে ছোট বাচ্চা এবং মেয়েদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দিত সেসব পুরুষ সন্তানকে যারা অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং গণীমতের মাল লুট করে এনেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে : পুরুষদের অংশ দু'জন নারীর সমান। যদি দু'য়ের বেশি মেয়ে হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিস হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার' (সূরা নিসা : ১১)। সুতরাং তাদেরকে অংশ থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর আইনের সম্পূর্ণ লংঘন বলে বিবেচিত হবে।

৪. আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়, পিতা মাতার মৃত্যুর পর ছেলে উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে মৃত ব্যক্তির মেয়ে উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করে। কোন কোন এলাকায় মেয়েরা ওয়ারিস স্বত্ব গ্রহণ করবে, এটিকে ঘৃণার বিষয় মনে করা হয়। এমন কুপ্রথাও প্রচলিত আছে যে, 'বাপের বাড়ির মীরাস গ্রহণ করলে সংসারে অশান্তি নেমে আসবে এবং সংসারের উন্নতি হবে না।' ফলে মেয়েটির স্বামী তাকে বাপের বাড়ির হক নিতে নিষেধ করে। সমাজের সুবিধাবাদী লোকেরাই মূলত নিজেদের বদ-মতলব চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের কুপ্রথা গড়ে তুলেছে। তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার দরুন মেয়েটি তার অংশ নিতে আর এগিয়ে আসে না। এ সমস্ত লোক দুষ্ট, লোভী ও স্বার্থপর। বোনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের দরুন অবশ্যই এদেরকে আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বোন মনে করে যে, অংশ চাইতে গেলে ভাই রাগ করবে অথবা ভাইয়ের সাথে মন কষাকষি হবে। ফলে সে তার অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অথবা চক্ষুলজ্জায় মাফ করে দেয়। এদিকে ধূর্ত ভাইটি নীরব ভূমিকা পালন করতে থাকে। এক সময় দেখে যে, বোনটি আর তার অংশ দাবি করছে না, প্রসংগক্রমে হয়ত জানতে পেরেছে যে, বোন মাফ করে দিয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন এ ধরনের মাফ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ভাইয়ের কর্তব্য হবে যেহেতু আদরের বোনটি নিজের অংশ চাইতে লজ্জা পাচ্ছে, তাই স্বেচ্ছায় বোনের অংশ ভাগ করে তাকে বুঝিয়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কারো উত্তরাধিকার হরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতের উত্তরাধিকার হরণ করবেন' (ইবনে মাজা)।

৫. মাঝেমধ্যে এমনটি হতে দেখা যায় যে, নিঃসন্তান ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীকে লিখে দেয়, এটি যেমন অবৈধ তেমনি মৃত ব্যক্তিটির সন্তান না থাকায়, তার ভাইয়েরা তার অসহায় স্ত্রীকে

তার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে অথবা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে তাকে স্বামীর ভিটেমাটি ছাড়া করে। এটিও মানবতার সাথে মারাত্মক অসদাচরণ।

৬. কারো শুধুমাত্র একটি অথবা দু'টি মেয়ে আছে। সে মনে করে যে, এরা অর্ধেক অথবা দুই তৃতীয়াংশ পাবে, বাকি সম্পত্তি অন্যেরা নিয়ে যাবে এটি কি করে হয়। তাই জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দেয়া হয়। এটি আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। আবার যারা আল্লাহর আইনটি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান রাখেন, তারা জায়েয করার নিমিত্তে তসবিহ, এক জিলদ কুরআন শরীফ ও একখানা জায়নামাযের পরিবর্তে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেন। এখানে নিয়তের ওপর আমি হামলা করতে চাই না। একটু শক্ত কথা বলতে চাই, 'আল্লাহ্ আপনার ও আমার চেয়ে অধিক কৌশলী এবং প্রত্যেকের মনের কথা জানেন।'

৭. বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্ট ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডগুলোর জন্য নমিনী বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের যে কোন একজন সদস্য যেমন স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মা-বাবা অথবা ভাইকে নমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যুর পর নমিনী পুরো অর্থই নিয়ে যায়। এ ধরনের অমানবিক ঘটনা আমাদের সমাজ-সংসারে হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলোও তাদের একাউন্টে নমিনী ঘোষণা দানের ব্যবস্থা রেখেছে। তবে এ ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে একটু ভিন্নধর্মী। সেখানে হিসাবধারী মূলত একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে থাকে। তার দায়িত্ব হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর মৃত্যুর পর একাউন্টের সমুদয় টাকা ইসলামী ফরায়েয অনুযায়ী মৃতের উত্তরাধিকারীদের ভাগ করে দেবে। কিন্তু বাস্তবতা তো তার বিপরীত। হিসাবধারীর মৃত্যুর পর সে কি আসলে তা ভাগ করে দেয়? আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সে ধরনের লোক কোথায়, যে অন্যের হক স্বেচ্ছায় বুঝিয়ে দিবে! এখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজেদের দায়িত্বের বোঝা হিসাবধারীর ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং মানবিক দিক চিন্তা করে সঠিক ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

৮. এতিমের মাল আগুন। সমাজে অপরিণামদর্শী কিছু লোককে এ আগুন নিয়েও খেলা করতে দেখা যায়। এতিম এবং নাবালেগ উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনেরা বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে আত্মসাৎ করে। এদেরকে বলবো, আপনি যদি আপনার চক্ষুশীতলকারী আদরের শিশু সন্তানটি নিয়ে একটু এভাবে চিন্তা করেন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে সে কি কি অভাবের সম্মুখীন হবে। তাহলে একজন এতিমের মর্মস্পর্শী হৃদয়ের অব্যক্ত কান্না আপনার বিবেককে অবশ্যই ব্যথিত করবে, আপনার উপলব্ধির করুণ মর্মবেদনা আপনার চোখকে অশ্রুসিক্ত করবে। এতিমের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী শুনে নিন : 'নিশ্চয় যারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেট শুধুমাত্র অগ্নি দ্বারা ভর্তি করছে এবং শীঘ্রই জ্বলন্ত অগ্নীকুণ্ডে প্রবেশ করবে' (সূরা নিসা : ১০)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : 'তোমরা এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও, উত্তম মালামালের সাথে খারাপ মালামালের

বিনিময় করো না এবং তাদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে সংমিশ্রণ করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড় ধরনের পাপ' (সূরা নিসা : ২)।

৯. দূরবর্তী আত্মীয়-এতিম ও মিসকীন যাদের মীরাসে কোন অংশ নেই তাদের সাথে যেন হৃদয়হীন ব্যবহার করা না হয়। একটু ইহসান, একটু ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দেয়া উচিত। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তারা যেন ফিরে না যায়। যদি এমনটি হয় তবে এর চেয়ে অমানবিক, নির্মম ও হৃদবিদারক আচরণ আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো' (সূরা নিসা : ৮)।

আমাদের সমাজ সংসারে প্রচলিত উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করব। মনে রাখবেন, আপনি আজ যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন, অচিরে আপনারও অনুরূপ পরিণতি হবে। প্রতিটি কৃতকর্মের জবাব আপনাকে দিতে হবে। দুনিয়ার সম্পদের লোভে যে হৃদয়হীন ব্যবহার আপনি করেছেন, যেদিন ফয়সালার সকল ক্ষমতার দণ্ড একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে, সেদিন যদি আপনার সাথে একই ব্যবহার করা হয়, তখন আপনার কি হবে?

আল-কুরআনে মিরাসী আইন বর্ণনা করার পর বলা হয় : 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, আল্লাহ তাকে আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি (সূরা নিসা : ১৩-১৪)। সুতরাং আপনারা মীরাস বন্টনে আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করবেন না, বরং সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আহকামুল কুরআন : আবু বকর আহমাদ আল জাসসাস র.
২. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী র.
৩. তাফহীমুল কুরআন : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
৪. সিরাজী : মুহাম্মদ আবু তাহের সিরাজী র.
৫. ইসলামী অর্থনীতি : মাওলানা আবদুর রহীম র.
৬. ফীযিলালিল কুরআন : সাইয়েদ কুতুব শহীদ র.
৭. ইসলামী আইনতত্ত্ব ও মুসলিম আইন : এস.বি রহীম
৮. মুসলিম আইন : অধ্যাপক আলতাফ হোসাইন

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ৮৯-১০৪

আকযিয়াতুর রসূল স.

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী

॥ তিন ॥

বিচারক নিয়োগের শর্ত

আবুইয়ালা আল ফাররা র. বলেন, নিম্নোল্লেখিত সাতটি শর্ত যে সব ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে কেবল তাদেরকেই বিচারক পদে নিয়োগ দেয়া যাবে। ১.পুরুষ হওয়া, ২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৩. মানসিক ভাবে সুস্থ হওয়া, ৪. স্বাধীন তথা মুক্ত হওয়া, ৫. মুসলমান এবং ন্যায় পরায়ণ হওয়া, ৬. সঠিক দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হওয়া এবং ৭. পর্যাপ্ত ইলম ও জ্ঞানপ্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া। (আল আহকামুস্ সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ৬০।)

আল মাওয়ারদী র. বলেন , ইবনে জারীর তাবারীর ব্যক্তিগত অভিমত হলো, সব ধরনের শরয়ী বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ফয়সালা দেয়া ও বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার নারীদের আছে। তাঁর এই মতামত ইজমা পরিপন্থী হওয়ার কারণে তেমন গুরুত্ব পায়নি। অবশ্য নিম্নোল্লেখিত আয়াতের আলোকেও বিচারক পদে নারীর অধিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা নিসা-আয়াত-৩৪)

উল্লেখিত আয়াতের আলোকে নারীকে পুরুষের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী করা জায়েয নয়। (আল আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-৬০)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবুবকর রা. হতে বর্ণিত। রসূল স. বলেছেন, সেই জাতি কখনো সফল হয় না, যাদের শাসক নারী। যেসব আলেম বিচার কাজে নারী নিয়োগের পক্ষে তাঁরা বলেন, এই হাদীসের মর্মার্থ হলো, খেলাফতের মসনদে নারীকে অধিষ্ঠিত না করা। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, যে সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সেসব ক্ষেত্রে নারীকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা জায়েয। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে হুদুদ ও কিসাস ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই নারীকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা জায়েয।

লেখক, মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ ইবনে তুল্লা আল-আন্দালুসী ৪০৪ হিজরী সনে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। 'আকযিয়াতুর রসূল' স. তাঁর অমর সংকলন, যা আজো সারা বিশ্বে মুসলমান গবেষক ও পাঠকদের কাছে অদ্বিতীয় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে আদৃত।

প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানী হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে, শিশু ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা যেহেতু নিজেরাই পরনির্ভরশীলতাই তারা অন্যের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার উপযুক্ততা রাখে না। তাছাড়া কোন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের পক্ষে কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ উদঘাটন করা, সাক্ষ্য দাতাদের বক্তব্যকে পরখ করার প্রজ্ঞা থাকে না। ফলে তারা বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না।

আযাদ বা স্বাধীন ব্যক্তি হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে, পরাধীন গোলাম ব্যক্তি অন্য কারো অভিভাবক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং তাদের সাক্ষ পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ হিসেবে গণ্য হয় না। আল মাওয়ারদী বলেন, পরাধীন বা গোলাম ব্যক্তি যেহেতু নিজের সত্তার উপরই কর্তৃত্বশীল থাকে না সে অন্যের উপর কর্তৃত্বশীল হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সেই সাথে যেহেতু গোলামের সাক্ষই গ্রহণযোগ্য নয় সেক্ষেত্রে তার ফয়সালা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। এর ভিত্তিতে বলা যায়, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ স্বাধীন নয় বিচারকের পদে তার অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন মুদাব্বির (এমন গোলাম যাকে তার মালিক এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন হয়ে যাবে) এবং মুকাতাব (এমন গোলাম নির্দিষ্ট অংক পরিশোধের শর্তে যার সাথে তার মালিক মুক্তির চুক্তি করেছে কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে চুক্তি মতো টাকা পরিশোধ করতে পারেনি।) অনুরূপ এমন গোলাম যার কিছু অংশ আযাদ আবার কিছু অংশ গোলামীর অন্তর্ভুক্ত (যেমন কোন এক গোলাম যদি কয়েকজনের মালিকানাধীনে হয়, আর তাদের কোন এক বা একাধিক জন আযাদ করে দিয়ে থাকে আর বাকীরা যদি শর্ত করে তুমি এই পরিমাণ টাকা পরিশোধ করলে আযাদ হয়ে যাবে) এমন অর্ধ স্বাধীন অর্ধগোলাম ব্যক্তিকেও বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না।

কারো গোলামী হওয়া ফাতওয়া ও হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কেননা ফাতওয়া দেয়া এবং হাদীস বর্ণনার জন্য স্বাধীন বা কর্তৃত্বশীল হওয়ার প্রয়োজন হয় না। কোন গোলাম যদি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যায় তাকে বিচারক বা কাজী পদে নিয়োগ করা যায়।

হযরত উমর রা. আবু হুযাইফা রা. এর আযাদকৃত গোলাম সালেম রা. সম্পর্কে বলেছিলেন, (তখন আহতাবস্থায় উমর শয্যাশায়ী ছিলেন) 'আজ যদি সালেম জীবিত থাকতো তাহলে তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে আমার কোন দ্বিধা হতো না।' আল মাওয়ারদী উমরের এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন, তখন সালেম আযাদ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আযাদ ব্যক্তিকে খিলাফতের মসনদে আসীন করার ব্যাপারে কোন বাধা ছিল না। (আদাবুল কাযী, আল মাওয়ারদী খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৩)

বিচারক পদে নিযুক্তির ব্যাপারে মুসলমান হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে, যেহেতু কোন ফাসিক (নীতিভ্রষ্ট ও অপরাধপ্রবণ) মুসলমানকে বিচারক পদে নিযুক্তি জায়েয নয়, কোন অমুসলিমকেও এমন দায়িত্বে নিযুক্ত করা যাবে না।

আলমাওয়ারদী র. বলেন, এ শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, কারো সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে মুসলমান হওয়া শর্তযুক্ত। (যেহেতু ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কারো সাক্ষই গ্রহণ করা হয় না, সেক্ষেত্রে বিচারক পদে কিভাবে নিযুক্ত করা যাবে?) এ প্রসঙ্গে কুরআন ঘোষণা করেছে, 'এবং আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখেন না।' (সূরা নিসা- আয়াত ১৪১) এ আয়াতের

আলোকে কোন কাফেরকে মুসলমানদের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করার অবকাশ নেই। এমনকি মুসলিম শাসনে অমুসলিমদের বিচারের জন্যও কোন কাফেরকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।' ইমাম আবু হানিফা বলেন, কাফেরকে তার ধর্মাবলম্বী বা অমুসলিমদের বিচারক পদে নিয়োগ করা যাবে। আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যে এই রীতি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। অনেক জায়গায় অমুসলিমদের ক্ষমতায়ন ও পদায়ন করা হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক অমুসলিমদের মধ্যে অমুসলিমদেরকে পদায়নের বিষয়টি আসলে বিচারের ক্ষেত্রে নয় সেটি প্রশাসনিক ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। একজন অমুসলিমকে তার স্বগোত্রীয় ও স্বধর্মীদের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় সে যদি স্বধর্মীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয় তা কার্যকর হবে। কেননা স্বধর্মী হিসেবে তার ফয়সালাকে সবাই মেনে নেবে।

অবশ্য সে স্বধর্মীদেরকে তার কোন ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবে না। কোন অমুসলিম নেতার কাছে যদি অমুসলিমরা তাদের বিষয়াদী মীমাংসার জন্যে যেতে আগ্রহী না হয় তবে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। এমতাবস্থায় তাদের বিচার ইসলামী আইনানুসারেই করা হবে। (আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী পৃষ্ঠা ৬৫, আরো বিশদ জানার জন্য দেখুন, আদাবুল কাযী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৩৪)

বিচারক (আদেল) ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে, ফাসেক ব্যক্তির দীন ও বিশ্বস্ততার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। বিচারকের দায়িত্ব একটি রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আমানত এবং দায়িত্বশীলতার বিষয়। কোন অবিশ্বস্ত ও ফাসেক ব্যক্তিকে এই গুরু দায়িত্বে নিযুক্ত করা যায় না। আলমাওয়ারদী বলেন, যে কোন ব্যক্তিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করার আগে তার বিশ্বস্ততা ও সততার বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। আদলের মর্মার্থ হলো, সেই ব্যক্তি সত্যবাদী, আমানতদার, হারাম ও নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যে কোন গোনাহ থেকে পরহেয করে চলে। তার যাবতীয় কার্যক্রম হয় সংশয় সন্দেহ মুক্ত। যে ক্ষুব্ধ ও উৎফুল্ল উভয় অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখে এবং দীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে কর্তব্যপরায়ণ হয়। এসব গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান সে একজন আদেল ব্যক্তি। তার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য এবং প্রশাসন ও বিচার বিভাগের যে কোন দায়িত্বে তাকে নিয়োগ করা যাবে। উল্লেখিত গুণাবলীর কোনটি যদি না পাওয়া যায় তাহলে তার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না, তাকে কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা যাবে না, তার কোন কথার তেমন মূল্য নেই, তার কোন নির্দেশ কার্যকর হবে না। (প্রাগুক্ত)

বিচারকের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সঠিক থাকা জরুরী। কেননা তাকে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষ অভিযোগ ও আপত্তি শুনে সাক্ষীদের মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ কোন দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে এ কাজগুলো করা সম্ভব নয়। তবে ইমাম মালেক র. এর মতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লোক প্রশাসক নিযুক্ত হতে পারে এবং তার সাক্ষও গ্রহণযোগ্য। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিচারকের দায়িত্বে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এমন মতভিন্নতা রয়েছে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিকতার ব্যাপারটি ধর্তব্য নয়। কারণ দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ছাড়া আর কোন অঙ্গের

বিচারকাজে কোন প্রভাব থাকে না। কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে এগুলো ছাড়াও প্রতিবন্ধীত্ব মুক্ত হওয়া জরুরী। কারণ একজন প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু ব্যক্তিকে প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন করা সমীচীন নয়। অবশ্য বিচারকের মতো গুরু দায়িত্বে যথা সম্ভব সর্বাঙ্গীন সুস্থ সুন্দর ব্যক্তিদেরই অধিষ্ঠিত করা উচিত, যাতে মানুষের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জাগে এবং তার সম্মোহিত করার মতো ক্ষমতা থাকে। (আলআহকামুস সুলতানিয়া, আল মাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ৬৫, আদাবুল কাযী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৬১৮ ও ৬২৫)

বিচারক পদে নিযুক্তির জন্যে শরয়ী বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা আবশ্যিক। শরয়ী বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার জন্য চারটি মৌলিক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এই চারটি মৌলিক বিষয় হলো,

১. আল কুরআনের নাসেখ, মানসূখ (রহিতকারী, রহিত) মুহকাম, মুতাশাবাহ (দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধক ও দ্ব্যর্থ অর্থবোধক) আম ও খাস (নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট) মুজমাল ও মুফাসসাল (সংক্ষেপ ও বিশদ) ইত্যাকার বিষয়াবলী ও সংশ্লিষ্ট বিধান সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকতে হবে।

২. রসূলুল্লাহ স. এর সুন্নাহ তথা তাঁর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। সেই সাথে হাদীসের সূত্র পরম্পরা হাদীসের প্রকারভেদ যেমন সহীহ, জঈফ, মুতাওয়াতির, খবরে ওয়াহিদ, মুতলাক ও মুকায়্যিদ ইত্যাদি সম্পর্কেও জরুরী জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। যেমন, কোন মাসআলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলেমগণের ইজমা রয়েছে আর কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞান থাকলে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সর্বসম্মত মাসআলার অনুসরণ করতে পারবেন আর মতভিন্নতাপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে নিজের বিবেচনাবোধ থেকে ইজতিহাদ করতে পারবেন।

৪. বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে তাকে কিয়াসের মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হতে হবে। কারণ যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রে সর্বসম্মত দলীলাদির ভিত্তিতে উসূলের নিয়মরীতির আলোকে নিজে ইজতিহাদ করে সমাধান বের করতে সক্ষম হবেন।

আল মাওয়ারদী লিখেছেন, বিচারক যখন শরয়ী বিধানের উল্লেখিত চারটি মৌলিক বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞাত হবেন, তখন দীনী বিষয়ে যাদেরকে ইজতিহাদের উপযুক্ত মনে করা হয় তাকেও অনুরূপ যোগ্য আলেম ব্যক্তিত্ব গণ্য করা হবে। এই ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ একাধারে ফাতওয়া দিতে পারেন, বিচারকার্যও পরিচালনা করতে পারেন, সেই সাথে অন্যান্য আলেমদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা এবং যে কোন মোকদ্দমার ফয়সালাও জানতে চাইতে পারেন। বস্তুত তিনি বিচার বিভাগ সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কাজও একই সাথে পরিচালনা করতে পারেন। বিচারকের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলী কিংবা এগুলোর কোনটি না পাওয়া যায় তাহলে তাকে আর কিছুতেই মুজতাহিদ বলা যাবে না। দীনের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি

মুফতির দায়িত্ব যেমন পালন করতে পারে না তদ্রূপ তাকে বিচারকের দায়িত্বেও নিয়োগ করা যাবে না। কোন কারণে যদি এ ধরনের ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিযুক্তি দেয়া হয় তখন সে সঠিক বিচার করুক আর বেঠিক করুক তার নিযুক্তি বাতিল বলে চিহ্নিত হবে এবং তার সঠিক ফয়সালাও অগ্রহণযোগ্য হবে। তার ভুল ফয়সালার কারণে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই ক্ষয়ক্ষতির দায় দায়িত্ব নিয়োগকারীর ঘাড়ে বর্তাবে।

আবু হানিফা র. এর মতে মুজতাহিদ নয় এমন লোককে বিচারক পদে নিয়োগ করা যায়। তখন যেসব জটিল বিষয় তার সামনে পেশ করা হবে এ ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ আলেমদের জিজ্ঞেস করে তাদের কাছ থেকে এর সঠিক সমাধান জেনে ফয়সালা দেবে। ইমাম আবু হানিফার ব্যক্তিগত মত ও জমহুরের ঐক্যবদ্ধ অভিমত হলো, ইজতিহাদ করার ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিযুক্তি বাতিল এবং তার দেয়া রায়ও অগ্রহণযোগ্য হবে। বস্তুত বিচারক হিসেবে এমন লোকের নিয়োগই বৈধ যিনি কঠোরভাবে সত্যকে অবলম্বন করেন। এমন নয় যে তিনি সত্যকে তার ব্যক্তিমতের তাবেদার বানান।

যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নিয়ে ফয়সালা করার যোগ্যতা রাখেন, ইমাম আবু হানিফা ও তার অনুসারীদের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ করা বৈধ। (আল মাবসূত, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৭২), হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪২৪)

ইবনে কুতায়বা নিজের সূত্রে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নে উল্লেখিত পাঁচটি গুণের অধিকারী না হবে সে বিচারক পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না।

১. তার পর্যাপ্ত ইলম জ্ঞান ও দূরদর্শিতা থাকতে হবে।

২. অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে যে কোন ধরনের দ্বিধা করে না।

৩. পদের প্রত্যাশী হবে না।

৪. শত্রুর প্রতি যে ন্যায় বিচার করার মতো মনোভাব সম্পন্ন।

৫. ইজমাকে অনুসরণ করবে।

বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে পূর্ববর্তী আলেমদের অনীহা

পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হতে প্রচণ্ড অনীহা পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হলো, বিচার খুবই জটিল ও ভারী কাজ। তাছাড়া হাদীসে বিচারকদের অন্যায় অপরাধে আখেরাতে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো– হযরত বুরাইরা রা. রসূল স. থেকে বর্ণনা করেন, 'বিচারক তিন ধরনের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে আর দুই প্রকার জাহান্নামী হবে। যে বিচারক সত্যকে অন্বেষণ করে এবং সত্যের উপর ফয়সালা করে সে হবে জান্নাতী। কিন্তু যে সত্যকে অনুসন্ধান করে চলে কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে সে হবে জাহান্নামী। অনুরূপ যে বিচারক অজ্ঞতা থাকার পরও ফয়সালা করে সেও হবে জাহান্নামী। (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা।)

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি, 'কেয়ামতের দিন ন্যায় বিচারকেরও এমন সময় আসবে যখন সে আফসোস করে বলবে, হায়, আমি যদি একটি খেজুরের ব্যাপারেও দু'জন বিবদমান ব্যক্তির বিচার না করতাম।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন। হযরত হামযা রা. রসূল স. এর সান্নিধ্যে গিয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন দায়িত্ব দিন যাতে আমি জীবনের ব্যয় মেটাতে পারি। তখন রসূল স. বলেন, হে হামযা! কাউকে জীবিত রাখা বেশি পসন্দ করো না হত্যা করে ফেলা? হযরত হামযা জবাবে বললেন, জীবিত রাখতে পসন্দ করি। তখন রসূল স. বললেন, তাহলে কোন পদ পদবীর লোভ করা উচিত নয়।'

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন। রসূল স. বলেন, যাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে কিংবা জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে, তাকে বরং ছুরির উল্টো দিক দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, হাকেম)

ইমাম শা'বী আল মাকসাদুল মাহমুদ এ বলেছেন, বিচারকের দায়িত্ব পালন খুবই কঠিন পরীক্ষা। যে এই পরীক্ষায় প্রবেশ করেছে সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে। কারণ এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। বস্তুত বিচারকের দায়িত্ব পালন থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরী। বিচারকের পদ প্রার্থনা করা একটা বোকামী যদিও এর মধ্যে সওয়াব ও পূণ্যের অবকাশ রয়েছে। (তারিখু কুযাতুল আন্দালুস, পৃষ্ঠা ১০)

আলতাবাহী তাঁর কিতাব 'তারিখু কুযাতুল আন্দালুস'-এ এমন অনেক শীর্ষ আলেমদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে বিচারকের পদে বরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু তারা এই পদ নিতে সম্মত হননি। এদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ, মুআব ইবনে ইমরান, আবাস ইবনে ঈসা ইবনে দিনার, কাসেম ইবনে আব্দুল মালেক শিবলী, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালাম আলখাশামী প্রমুখ। (তারীখু কুযাতুল আন্দালুস পৃষ্ঠা ১২)।

আবু কালাবাকে বিচারকের দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাব করলে তিনি ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সিরিয়ার বিচারককে অব্যাহতি দিয়ে দিলে আবু কালাবা সিরিয়া ত্যাগ করে ইয়ামামায় এসে আশ্রয় নেন। (যাতে তার বিচারকের দায়িত্বে আসীন হতে না হয়।) সুফিয়ানে ছাওরী সম্পর্কে বলা হয়, তাকে বিচারকের দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাব করলে তিনি বসরায় চলে আসেন এবং অনেকটা আত্মগোপন করে থাকেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এভাবে আত্মগোপন করেই ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা র. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, বিচারকের দায়িত্ব কবুল না করায় তাকে বন্দী করে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় তবুও তিনি জীবনে কখনো বিচারকের আসনে আসীন হননি।

উল্লেখিত মনীষীগণ ছাড়াও পূর্ববর্তী বহু খ্যাতনামা আলেম বিচারকের দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ ও ইতিহাসের গ্রন্থে এমন বহু ঘটনা রয়েছে। বিচারকের পদে অনীহা প্রকাশকারীদের মধ্যে আলেম ও ফকীহগণ যেমন ছিলেন অনুরূপ মুহাদ্দিস, জাহেদ ও

আবেদ ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁদের অনেককেই বিচারক পদে আসীন হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্যে গালমন্দ করা হয়, দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়, বন্দী করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হয় কিন্তু তবুও তাঁরা বিচারকের দায়িত্ব নিতে সম্মত হননি। শাসকদের নির্যাতন নিপীড়নকে তারা অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাসহকারে হজম করেছেন এবং এজন্যে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশা করেছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শাসনে খলীফার পরই বিচারকের অবস্থান। সম্মান মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পদ। যুগে যুগে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাদের সময়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ন্যায় বিচারের প্রশ্নে যে বিচারক কোন জুলুম নির্যাতন গালমন্দ অপপ্রচারকে পরওয়া করেন না, তাদের প্রশংসায় বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বর্ণনা করেন। নবী করীম স. বলেন, দুই প্রকার মানুষের ক্ষেত্রে শুধু ঈর্ষা করা যায়। প্রথমত যাকে আল্লাহ তাআলা পর্যাপ্ত সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে সুপথে সেই সম্পদ খরচ করার তৌফিকও দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা দীনের গভীর জ্ঞান পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতা দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার দেয়া জ্ঞান ব্যবহার করে সে ন্যায় বিচার করে এবং নিজে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকে।

২. হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন। নবী করীম স. বলেন, 'তোমরা কি জানো, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে কে আল্লাহর ছায়ার নীচে আশ্রয় পাবে? সাহাবাগণ আরয করলেন, আল্লাহ ও রসূলই ভালো জানেন। রসূল স. বললেন, যারা সত্য উপলব্ধি করার সাথে সাথে তা কবুল করে নেয় এবং যখন তাদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সঠিক জবাব দেয়। এবং তাদেরকে যখন মুসলমানদের বিচারকের আসনে আসীন করা হয় তখন এমনভাবে ফয়সালা করে যেন তার নিজের বিচার করছে। (হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদে, আবু নঈম তাঁর হুলয়া এবং আবুল আব্বাস তাঁর আদাবুল কাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

৩. হারেস ইবনে উসামা তাঁর মুসনাদে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন। রসূল স. বলেছেন, 'জনগণের প্রতি কোন শাসকের একদিনের ইনসাফ কোন আবেদের আপন ঘরে শত বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' রসূল স. শত বছর বলেছেন না পঞ্চাশ বছর বলেছেন এ ব্যাপারে রাবী সন্দিহান।'

৪. সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, 'সাত ধরনের লোককে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া দেবেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। এই সাত প্রকার লোকের মধ্যে সর্বপ্রথম রসূল স. ন্যায় বিচারক শাসকের উল্লেখ করেছেন।

রসূল স. বহু হাদীসে, বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের উপর অবিচল থাকার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। উভয় বিধ বর্ণনা থাকার কারণে মুহাদ্দিসগণ উভয় প্রকার বর্ণনার মধ্যে

সামঞ্জস্য বিধানের পথ অনুসরণ করেছেন। উলামায়ে কেরাম বলছেন, যারা পদ পদবী লাভে উৎসাহী তাদেরকে বিচারক পদে আসীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ যখন প্রার্থীত পদে আসীন হয় তখন তারা ন্যায় বিচার করতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে সেইসব ব্যক্তিবর্গকে যারা এ ধরনের পদ লাভে অতি উৎসাহী নয়। এবং যারা এ ধরনের পদে বরিত হলে গুরুত্ব সহকারে সঠিক ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করবে। আমার জানা মতে, এ বিষয়ের উপর ইবনে ফারহুন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তারা ইবনে ফারহুনের 'তাবসিরুল হুককাম' গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।

হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত আন্দালুসে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়ন

৯০ হিজরী সনে খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে মূসা বিন নুসাইর ও তারেক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুস তথা স্পেন ইসলামী শাসনের অধীনে আসে। স্পেন ছিল তৎকালীন মুসলমানদের ইপ্সিত ভূখণ্ডগুলোর অন্যতম যেগুলোকে ইসলামী শাসনের অধীনে নিয়ে আসার কাজে সচেষ্ট ছিলেন তৎকালীন মুসলিম শাসক, দাঈ ও মুজাহিদবৃন্দ। স্পেন বিজয়ের সাথে সাথে প্রথম শতাব্দীর অসংখ্য অভিজ্ঞ আলেম মুহাদ্দিস তথা সব ধরনের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ সেখানে যেতে শুরু করেন। মুসলিম জ্ঞানী গুণীদের অবাধ পদচারণায় স্পেন নানাবিধ বরকত ও জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হতে শুরু করে। খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয র. ইসলামের প্রচার প্রসারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় আসার পর বিপুল সংখ্যক আলেম, ফকীহ, কারী, মুফাসসির তথা জ্ঞানী গুণী মানুষকে স্পেনে প্রেরণ করেন। ফলে তাদের দেখাদেখি জ্ঞানী ব্যক্তিদের আনাগোনা আন্দালুসে আরো বেড়ে যায়।

চতুর্থ হিজরীতে এসে স্পেন বিশেষজ্ঞ আলেম, অসংখ্য ইলমী প্রতিষ্ঠান, বিশাল বিশাল লাইব্রেরী, বিপুল সংখ্যক মসজিদ নিয়ে ইসলামের মূল শহরগুলোর মতোই সমৃদ্ধ ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত হয়।

আমীরুল মুমিনীন আল হাকিম মুসতানসীর বিল্লাহ ৩৫০ হিজরী থেকে ৩৬৬ হিজরী পর্যন্ত স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খুবই বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। স্পেনের ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার অবদান খুবই তাৎপর্যময়। তিনি আরব থেকে অসংখ্য জ্ঞানী ও গুণীজনকে স্পেনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞানীদের খুবই সম্মান করতেন তিনি। তার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে বড় বড় লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। তিনি বাগদাদ ও অন্যান্য এলাকা থেকে অসংখ্য কিতাবাদী সংগ্রহ করেছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান তথা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টারী পুস্তকাদি তিনি বাগদাদ থেকে সংগ্রহ করেন। খলীফা মুসতানসির বিল্লাহকে জ্ঞান সেবক হিসেবে খলীফা মামুনুর রশীদের সাথে তুলনা করা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল মাককারী শাসক মুসতানসির বিল্লাহ সম্পর্কে বলেন, শাসক মুসতানসির বিল্লাহ ইলমের সেবক ছিলেন। তিনি আলেমদের খুবই মর্যাদা ও সম্মান করতেন। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানী ব্যক্তি ও নানা বিষয়ের গ্রন্থরাজী সংগ্রহে তার আগ্রহ ছিল অদম্য। তাঁর আগের কোন শাসক এতো বেশি সংখ্যক কিতাবাদী সংগ্রহ করেননি। (নাফহুত্তীব লিল মাক্কারী, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৬১)

ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর খ্যাতনামা একজন আলেম ছিলেন। তিনি আন্দালুসের শিক্ষা ও জ্ঞানোন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, 'স্পেন শাসক মুসতানসির বিল্লাহর লাইব্রেরীতে ৪৪টি গ্রন্থ তালিকা ছিল, প্রত্যেকটি গ্রন্থতালিকার পৃষ্ঠা ছিল বিশটি। এগুলোতে শুধু কিতাবের নামগুলো লেখা ছিল। (নাফহুত্তীব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৩৬৬)

ইবনে হাযম স্পেন শাসক মুনতানসির বিল্লাহর আমলের হাদীস শাস্ত্রের উপর সংগৃহীত পুস্তকাদির নাম উল্লেখ করেন। তা থেকেই আন্দাজ করা যায় অন্যান্য বিষয়াদিতে যেমন, আদব, ভাষা, ইতিহাসে সংগৃহীত গ্রন্থাদির পরিমাণ কত বিপুল ছিল।

হাফেয যাহবী লিখেছেন, কোন এক ব্যক্তি ইমাম ইবনে হাযমকে বললো, হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক র. এর মুআত্তা শ্রেষ্ঠ। তিনি বললেন, না কথাটি ঠিক নয়। সবচেয়ে ভালো কিতাব তো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিন্তু এ দুটো ছাড়াও নিম্নোক্ত কিতাবগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– (১) সহীহ সাঈদ ইবনে সিক্কিন, (২) আল মুনতাকা ইবনুল জারুদ, (৩) আল মুনতাকা কাসিম ইবনে আসনা, (৪) আবু দাউদ, (৫) নাসাঈ, (৬) মুসান্নাফ কাসিম ইবনে আসনা, (৭) মুসন্নাফ তাহাবী, (৮) মুসান্নাফ আলবায্যার, (৯) মুসনাদ ইবনে আবী শায়বা, (১০) মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, (১১) মুসনাদে ইবনে রাহওয়াই, (১২) মুসনাদে তায়ালিসী, (১৩) মুসনাদ হাসযান ইবনে সুফিয়ান, (১৪) মুসনাদ সাজ্জার, (১৫) মুসনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আস্সুনদী, (১৬) মুসনাদ ইয়াকুব ইবনে শায়বা, (১৭) মুসনাদ আলী মাদানী, (১৮) মুসনাদ ইবনে আবী গারাযাহ। এ ধরনের আরো কিছু কিতাবের নামোল্লেখ করেন তিনি, যেগুলো হাদীস ভিত্তিক।

ইবনে হাযম হাদীসের তালিকা উল্লেখ করার পর সেই সব কিতাবের উল্লেখ করেন যেগুলোতে হাদীসের পাশাপাশি সমকালীন আলেম ও ইমামদের মতামত এবং অভিব্যক্তিও সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন– (১) মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক, (২) মুনান্নাফ আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, (৩) মুসান্নাফ তাকী ইবনে মুখাল্লাদ, (৪) কিতাব মুহাম্মদ ইবনে নাসার আলমারওয়াযী, (৫) কিতাব আবু বকর ইবনুল মুনযির আল আকবর ও আল আসগার, (৬) মুসান্নাফ ওয়াকী, (৯) মুসান্নাফ ফারয়াবী, (১০) মুআত্তা ইমাম মালেক, (১১) মুআত্তা ইবনে আবু যীব, (১২) মুআত্তা ইবনে আবু ওয়াহাব, (১৩) মাসায়েল আহমদ ইবনে হাম্বল, (১৪) ফিকহে আবু উবায়দ, (১৫) ফিকহে আবু সাওর ইত্যাদি। (নাফহুত্তীব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৬১-১৭০ ও তাযকিরাতুল হুফ্ফায খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ১১৫৩)।

সে সময় স্পেনে, তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, সাহিত্য, ভাষা, অলংকার, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ফিকহ, বিজ্ঞান, দর্শন, সৌর বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদিতে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ রচিত কিতাবের বিশাল বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। মোট কথা সেই সময় স্পেন ছিল বহুমুখী ইলম চর্চার প্রাণকেন্দ্র। জ্ঞানের চর্চায় তৎকালীন স্পেন অন্যান্য প্রাচ্য রাষ্ট্রের তুলনায় উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। মনে রাখতে হবে ইবনে হাযম শুধু সেইসব কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন, বার্বার হাঙ্গামার ধ্বংসের হাত থেকে যেসব কিতাব রক্ষা পেয়েছিল। কেননা ৩৯৯ থেকে ৪০৩ হিজরী পর্যন্ত অব্যাহত বিস্তৃত বার্বার ধ্বংসযজ্ঞে অধিকাংশ লাইব্রেরী নষ্ট ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ইবনে খলদুন

বলেন, 'স্পেনের আব্দুর রহমান আন-নাসেরের সময়ের লাইব্রেরী কর্ডোভার রাজমহলে সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু বার্বাররা কর্ডোভা অবরোধ করলে লাইব্রেরীর অধিকাংশ গ্রন্থ বিক্রি করে দেয়া হয়। মনসুর বিন আবু আমেরের মুক্তি দেয়া গোলাম ওয়াজেহ তখন কোতোয়াল পদে আসীন ছিলেন। তিনি লাইব্রেরীর কিতাবগুলোকে লাইব্রেরী থেকে বের করার নির্দেশ দেন। আর বার্বাররা যখন কর্ডোভায় প্রবেশ করতে শুরু করে তখন লোকেরা যে যার মতো করে লাইব্রেরীর গ্রন্থাদী লুট করে নিয়ে যায়। (তারীখু ইবনে খালদুন খণ্ড. ৪, পৃষ্ঠা ৩১৭)

অনেকেই এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসের যে গ্রন্থরাজীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো থেকে কিছু কিতাব ইবনে তুল্লা'র হস্তগত হয়েছিল এবং সেগুলো থেকে তিনি উপকৃতও হয়েছিলেন। আপনি ইবনে তুল্লা'র এই কিতাব আকযিয়াতুর রসূল এর শেষে এমনই কিছু কিতাবের উল্লেখ দেখতে পাবেন। ইবনে তুল্লা' এসব কিতাব থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। শুধু তাই নয় উদ্ধৃতির পাশাপাশি তিনি এসব কিতাবের লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও দিয়েছেন।

স্পেনীয় খৃস্টানদের হাতে যখন মুসলিম স্পেনের শেষ শহর গ্রানাডার পতন ঘটে (৮৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৪৯২ খৃ.) তখনও পর্যন্ত স্পেনের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য ইসলামী গ্রন্থরাজীর সংগ্রহশালা ছিল। ইসলাম বিদ্বেষে ক্রুদ্ধ হয়ে তলীতালার শাসক লর্ডপাদ্রী কার্ডিনাল খাসিস ইসলামী লাইব্রেরী ও গ্রন্থরাজী সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। কারণ সে জানে এসব লাইব্রেরী ও ইসলামী গ্রন্থরাজী যদি অক্ষুণ্ন থাকে তাহলে নতুন খৃস্টান প্রজন্ম এগুলো পড়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি গ্রানাডা ও আশপাশের এলাকায় যতো লাইব্রেরী ও গ্রন্থরাজি মজুদ ছিল সব গ্রন্থরাজী এক জায়গায় একত্র করার নির্দেশ দিলেন। লর্ড কার্ডিনালের নির্দেশ মতো গ্রানাডা অঞ্চলের সকল গ্রন্থরাজী এক জায়গায় একত্র করা হলে বিশাল মাঠে বিরাট বিরাট কিতাবের স্তুপ হয়ে গেল। অবশেষে তার নির্দেশে সব গ্রন্থরাজি জ্বালিয়ে দেয়া হল। বলা হয় এ সময় অন্তত দু'লাখের চেয়ে বেশি কিতাব পুড়িয়ে দেয়া হয়।

এর পরই শুরু হলো আরবী ও ইসলামী গ্রন্থ সংহারের মূল অভিযান। খৃস্টান শাসকরা সারা দেশ থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে আরবীতে লেখা কিতাব পুড়িয়ে দেয়ার অভিযান চালু করল। তখন খৃস্টানদের নির্যাতনে জীবন বাঁচাতে যেসব মুসলমান খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের জন্যে আরবী বলা নিষেধ করা হলো। সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে কুশতালী....ভাষা বাধ্যতামূলক করা হল। খৃস্টানদের এই অভিযানের মধ্যেও কিছু গ্রন্থরাজীকে রক্ষা করে স্কোরিয়াল রাজপ্রাসাদে পাঠানো হল যাতে ওখানকার শাহী মহলের লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৬৭১ সালে শাহী লাইব্রেরীতে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে যায় এবং সব গ্রন্থরাজী পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই অগ্নিকাণ্ড থেকে দুই হাজার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি অক্ষত থাকে। (আল আসারুল আন্দালুসিয়া আলাবাকিয়া, পৃষ্ঠা ৪৩০-৪৩৩)

আন্দালুস নিজস্ব ভূপ্রকৃতির কারণে নজর কাড়া ছিল। আন্দালুসের প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দর পাহাড়, প্রবহমান নদী আর ঘন সবুজ বৃক্ষরাজী ও শস্য শ্যামল মাঠপ্রান্তরের মনোরম দৃশ্য বর্ণনাতীত।

মুসলিম স্পেনের জায়গা জায়গায় গড়ে উঠেছিল লাইব্রেরী। আর এসব লাইাব্রেরীতে গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে বহু বর্ণের মানুষ অধ্যয়ন অধ্যবসায়ে ডুবে থাকতো। ফলে বহু জায়গা থেকে বহু বর্ণ ও গোত্রের জ্ঞানপিপাসুরা স্পেনের লাইব্রেরীগুলোতে জ্ঞানচর্চার জন্যে হাজির হতো।

মুসলিম স্পেনের সর্বক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল সুন্দর সুন্দর মসজিদ। এসব মসজিদে অগণিত মুসলমান নামায কালামে লিপ্ত থাকতো। সব কিছুর উর্ধে স্পেনের প্রধান আকর্ষণ ছিল সেখানকার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীজনেরা। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, ইতিহাস, সাহিত্য, চিকিৎসা, কেরাত তথা এমন কোন মৌলিক ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ছিল না যেসব বিষয়ে স্পেনে চর্চা না হতো। ইসলামের সূচনা লগ্নেই মুসলমানরা স্পেনে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই সেখানে মুসলমানদের আনাগোনা অব্যাহত ছিল। সেই ভালোবাসা থেকেই মুসলমানরা স্পেনের মাটিকে আপন করে নেন। স্থানীয়রাও ইসলামকে সানন্দে স্বাগত জানায়। দীর্ঘ ৮০০ (আটশ) বছরের শাসনামলে মুসলিম নেতৃবর্গ কখনো কল্পনাও করেননি, মুসলিম শাসকগোষ্ঠীই নয় গোটা মুসলিম অধিবাসীদেরকেই স্পেন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে অথবা হতে পারে। কিংবা মুসলিম ধ্বংসযজ্ঞ করা হবে।

কিন্তু কতিপয় আরব গোত্রের হিংস্রতা, কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা ও উগ্রতার কারণে গোত্র দ্বন্দ্ব, উমাইয়া আব্বাসীয় সংঘাত, বার্বারদের জিঘাংসা, শাসকদের আত্মকলহ ও গোষ্ঠীগত হাঙ্গামার সুযোগে খৃস্টান চক্রান্তকারীরা ধীরে ধীরে মুসলিম শাসনের ভেতরটা ফোকলা করে ফেলে। পরবর্তীতে মুসলমান ও ইসলামের অনুসারীদেরকে হারাতে হয় রক্তের বিনিময়ে বিজিত মূল্যবান স্পেন। শেষ পর্যায়ে স্পেনীস মুসলমানদের দুর্দশা ও যন্ত্রণায় কাঁদার মতো কেউ ছিল না এবং স্পেনে কোন মুসলমানের চিহ্ন ছিল না। খৃস্টানরা স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের পর কোন মুসলিম ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখেনি। সকল মসজিদ মাদরাসা পাঠাগার ধ্বংস করে দেয়া হয়। লাইব্রেরী ও পাঠশালাগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মসজিদগুলোকে পানশালা ও বাজারে পরিণত করা হয়। আটশ বছর ধরে অগণিত মুসলমানের জীবনের বিনিময়ে গড়ে ওঠা মুসলিম স্পেন অল্পদিনের মধ্যে খৃস্টান স্পেনে রূপান্তরিত হয়। মুসলমানদের স্পেন বিজয় ও কীর্তিগাথা পরিণত হয় ইতিহাসে।

পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর শুরুতে দামেশক থেকে যে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠী গোটা মুসলিম বিশ্বকে দীর্ঘ দু'শ বছর পর্যন্ত শাসন করেছিলেন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্পেনের মাটিতে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উমাইয়া শাসকগণ ধারাবাহিকভাবে মুসলিম বিশ্বে উন্নতি করেছিলেন। তাদের সময়ে স্পেনে অসংখ্য মসজিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেন ইলম ও জ্ঞান চর্চার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, বিচারক, চিকিৎসক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকগণ তাদের জ্ঞানপ্রচার প্রসার এবং জ্ঞান পিপাসুরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্যে স্পেনে পদার্পণ

করেছিলেন। তখন প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে পিছনে ফেলে স্পেন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল।

কিন্তু হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে শাসকদের আত্মকলহ ও গৃহ বিবাদের কারণে স্পেনের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ইদ্রিসী নামের এক শাসক যাকে বনু হামেদ নামেও ডাকা হতো শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন। ইদ্রিসী মায়েকা নামক স্থানে বসবাস করতেন। তার বংশপরম্পরা হযরত আলী রা. ও হযরত ফাতেমা রা. এর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। তৃতীয় হিজরী সনে এই ইদ্রিসী বংশের লোকেরা মাগরিবে মরক্কো একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার রাজধানী ছিল ফাস। কিন্তু স্পেনের উমাইয়া শাসকদের হাতে সেই রাজ্যের পতন ঘটে ফলে তাদের খান্দান মিসর, মাগরিব ও স্পেনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

স্পেনের গৃহবিবাদ যখন তুঙ্গে তখন স্পেনে বসবাসকারী ইদরিসী খান্দানের আলী ইবনে হাম্মুদ কয়েকটি বিবদমান পক্ষকে পদানত করে নিজেকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আলী আফ্রিকী সেনা ইউনিটের সেনাপতি ছিলেন। ৪০৭ হিজরী সনে আলী স্পেনের শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকে ইদরিসীদেরকে স্পেনে আলাভী বা বনু হামুদ নামে ডাকা হয়। আলী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মাত্র দু'বছর ছিলেন কিন্তু তিনি তার খান্দানের জন্যে ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করে যান। ৪৪৭ হিজরী পর্যন্ত তার খান্দানের লোকেরাই স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এরপর জাযিরা ও মালেকা রাজ্যের পতনের সাথে সাথে ইদরিসী শাসনের অবসান ঘটে। তদস্থলে জগৎ বিখ্যাত বিজেতা ইউসুফ বিন তাশফিনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউসুফ বিন তাশফিন ছোট ছোট মুসলিম রাজ্য শাসক ও খৃস্টান চক্রান্ত কারীদের পদানত করে ৪৮৭ হিজরী সনে গোটা স্পেনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইউসুফ বিন তাশফিনের এই অভিযান ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে স্পেনের মুসলিম শাসকদের মধ্যে গৃহবিবাদে যে আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়েছিল তা দূরীভূত হয়ে স্পেন পুরোদস্তুর আবার একটি এককেন্দ্রিক মুসলিম রাষ্ট্রের অবয়ব ফিরে পায়। সুলতান ইউসুফ খণ্ডবিখণ্ডে ভঙ্গুর স্পেনকে শতধাবিভক্তি থেকে রক্ষা করেন এবং বিভিন্ন খণ্ডিত রাজ্যের জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের জুলুম থেকে সাধারণ মানুষকে নাজাত দেন। বলা চলে সুলতান ইউসুফ স্পেনকে জালেম শাসকদের হাত থেকে পুনর্বার জয় করেন।

সুলতান ইউসুফ তার শাসনামলে দেশের সর্বত্র ইসলামী কৃষ্টিকালচারকে পুনরুজ্জীবিত করেন। একদিকে আটলান্টিক সাগরের তীর থেকে মিসর পর্যন্ত এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর (বাহরে আবয়াজ) থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত তার শাসন বিস্তৃত ছিল। ৫০০ শত হিজরী সনে শত বছর বয়সে সুলতান ইউসুফ ইন্তেকাল করেন। তার গোটা জীবনটাই কেটেছে গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিময় কর্মকাণ্ডে। (তারীখে ইবনে খাল্লিকান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৬৬, ৪৩১, ৪৩৫, আল কামেল লি ইবনু আসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৭, নাফহুত্‌তীব আলমাক্কারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭, সুবহুল আশা খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৪, জার্মান ঐতিহাসিক ইউসুফ আতবাখ রচিত তারীখে আন্দালুস, পৃষ্ঠা ২৬)

সুলতান ইউসুফ বিন তাশফিন ইলম, উলামা ও দীন ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইবনে আমীর এই কৃতী শাসক সম্পর্কে বলেন, 'সুলতান ইউসুফ বিন তাশফিন খুবই কর্মঠ, নীতি পরায়ণ ও সৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। দীনদার ও জ্ঞানী আলেমদের সাথে খুবই হৃদ্যতা বজায় রাখতেন। তিনি আলেমদের সম্মান করতেন এবং তাদের পরামর্শ মতো কাজ করতেন। তিনি যখন আন্দালুসের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন সেখানকার ফকীহদের ডেকে তাদের খুব সম্মান করেন। ফকীহ ও আলেমগণ তাকে পরামর্শ দিলেন, বাগদাদের কেন্দ্রীয় খলীফার পক্ষ থেকে আপনার স্বীকৃতি নেয়া দরকার। তাহলে শরীয়ার আলোকে আপনার নির্দেশ পালন করা প্রত্যেকের জন্যে ওয়াজিব হবে। আলেমদের পরামর্শে সুলতান বাগদাদের খলীফা মুসতাজহার বিল্লাহর কাছে বহু মূল্যবান হাদিয়া তুহফাসহ দূত প্রেরণ করেন। দূতের কাছে তিনি এক পয়গামে তার বিজয় সাফল্য এবং বিভিন্ন ইসলামের বিভিন্ন খেদমতের কথা বিস্তারিত উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি আন্দালুসের শাসক হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দানের আবেদন করেন। সুলতানের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাগদাদের খলীফা তাঁকে অনুমোদন দেন। শুধু অনুমোদনই নয় তাঁকে স্বাধীন সুলতান ও আমীরুল মুমিন অভিধায় ভূষিত করা হয়।

ইবনুল আসীর এ সম্পর্কে লিখেন, সুলতান ইউসুফ মুরাবেতীদের জন্যে মরক্কো শহরের পত্তন করেন। ৫০০ শত হিজরী সন পর্যন্ত তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বছরই তিনি ইন্তেকাল করেন। সুলতান ইউসুফের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলী ইবনে ইউসুফ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁকেও আমীরুল মুমিনীন অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়। তিনি পিতার মতোই আলেমদের সম্মান করতেন। এবং আলেমদের পরামর্শ মতো চলতেন। তাঁকে যদি কেউ কোন উপদেশ দিতো, সুলতান আলী তার কথা খুবই মনোযোগ এবং বিনয়ের সাথে শুনতেন।

ইমাম ইবনে তুল্লা'র সমসাময়িক মনীষীবৃন্দ

আমরা এখানে এমন কয়েকজন আলেমের আলোচনা করবো সেসময় তাঁরা প্রতেকেই ছিলেন ইলমের একেকজন দিকপাল। তাঁদের কাছ থেকে ইমাম ইবনে তুল্লা উপকৃত হয়েছেন যদিও অনেকেই তাঁর উস্তাদ ছিলেন না। পর্যায়ক্রমে মৃত্যুসন অনুযায়ী আমরা এখানে তাদের উল্লেখ করবো।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে উসমান ইবনে সাঈদ। মৃত্যু ৪২৪ হিজরী। তিনি টলেডোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি বড় মাপের আলেম, ফাযেল, মুত্তাকী, যাহেদ ও আবেদ ছিলেন।

২. আবু মুহাম্মদ আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ। মৃত্যু ৪২৭ হিজরী। সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আহমদ। ইবনে দাহুন নামে খ্যাত ছিলেন। মৃত্যু ৪৩১ হিজরী। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন এবং বড় মাপের মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন।

৪. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল বাজী আল লাখমী। মৃত্যু ৪৩৩ হিজরী। তিনি ছিলেন আশবিলিয়ার অধিবাসী ও বড় মাপের ফকীহ। শুরা ও ইলমুল ওছায়েক

(উপস্থিত সংকট সমাধান ও দলীল দস্তাবেজ) সম্পর্কে তিনি সমকালীনদের মধ্যে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কীত তার রচিত কিতাবের উপর উলামায়ে কেরাম নির্দ্বিধায় নির্ভর করেন।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আনসারী মালেকী। মৃত্যু ৪৩৪ হিজরী। সমকালীনদের মধ্যে তিনিও অনেক বড় আলেম যাহেদ মুত্তাকী ও ফাযেল ছিলেন।

৬. কাযী আবুল ওয়ালীদ আলবাজী। মৃত্যু ৪৩৫ হিজরী। তিনি একাধারে মুতাকাল্লিম, ফকীহ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ছিলেন। 'মুআত্তা'-এর ভাষ্যগ্রন্থ 'আলমুনতাকা' তাঁর ইলমী প্রজ্ঞার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৭. মারওয়ান ইবনুল আলী আল আসরী আল কাত্তান। মৃত্যু ৪৪০ হিজরী। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। আলবোনী নামেই সমাধিক পরিচিত ছিলেন। বড় মাপের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মুআত্তা ইমাম মালেক-এর ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন।

৮. উসমান ইবনে সাঈদ ইবনে উমর আল আমুবী আবু আমর আদদানী। মৃত্যু ৪৪৪ হিজরী। তিনি সমকালীনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ছিলেন।

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বার। মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী। আন্দালুসের একজন অসাধারণ হাফেযে হাদীস ছিলেন। আততামহিদ ও আল-ইসতিয়াব নামক গ্রন্থ দুটির প্রণেতা।

১০. আলআ'লা ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে হাযাম। মৃত্যু ৪৫৪ হিজরী। তিনি বড় মাপের সাহিত্যিক ও আলেম ছিলেন।

১১. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আনসারী। ইবনে শিককুল লাইল হিসেবে খ্যাত ছিলেন। মৃত্যু ৪৫৫ হিজরী। বড় মাপের হাফেযে হাদীস ও ফকীহ ছিলেন।

১২. আহমদ ইবনে মুগীছ ইবনে আহমদ ইবনে মুগীছ আসসাদকী। মৃত্যু ৪৫৯ হিজরী। ইলমুল ফারায়েয, ভাষা, নাহু ও তাফসীর শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। 'আলমুগনি' নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৩. আমর ইবনে হাসান আবু হাফস আল হুযনী। মৃত্যু ৪৬০ হিজরী। অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও বড় মাপের আলেম ছিলেন।

১৪. আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল কদ্দুস আল কুরতবী। মৃত্যু ৪৬১ হিজরী। ক্বিরাত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ক্বিরাত শাস্ত্রের উপর তিনি 'আল মিফতাহ' নামে কিতাব রচনা করেন।

১৫. মূসা ইবনে বুদাইল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তাবিত আলবকরী আল কুরতবী। ইবনে আবু আব্দুস সামাদ নামে খ্যাত ছিলেন। মৃত্যু ৪৬২ হিজরী। অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। বহু বড় আলেম ফাযেল বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

১৬. আবদুল আযীয আব্দুল্লাহ ইবনে বাকালা আসসাদী আশশাতবী। মৃত্যু ৪৬৫ হিজরী। আবু উবায়দে প্রণীত 'গরীবুল হাদীস' কিতাবটিকে তিনি আরবী বর্ণমালা অনুসারে গ্রন্থনা করেন।
১৭. আবু মারওয়ান ইবনে হাইয়ান আল কুরতবী। মৃত্যু ৪৬৯ হিজরী। ঐতিহাসিক হিসেবে বেশি পরিচিত। তিনি আল মুকতাবিস মিন আবনায়ে আন্দালুস' গ্রন্থ রচনা করেন।
১৮. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রিযকী আল আমুবী আবু জাফর। মৃত্যু ৪৭৭ হিজরী। একাধারে ফকীহ, হাফেযে হাদীস ও দূরদর্শী ছিলেন। তার যে কোন পরামর্শকে সে সময় খুব গুরুত্ব দেয়া হতো।
১৯. ঈসা ইবনে সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ আল আসাদী আবুল আসবাগ। হাইয়ানের অধিবাসী ছিলেন। ৪৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে বশকুল বলেন, ঈসা ইবনে সাহাল ছিলেন অসাধারণ আলেম হাফেযে হাদীস ফকীহ। উপস্থিত যে কোন সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন অনন্য।
২০. আব্দুল মালেক ইবনে সিরাজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিরাজ আল কুরতবী। ৪৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন ভাষার ক্ষেত্রে ইমাম।
২১. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আত্তাব ইবনে মুহসিন আবুল কাসিম আলকুরতবী। মৃত্যু ৪৯১ হিজরী। বড় মাপের হাফেয ফকীহ ও মুফতী ছিলেন।
২২. হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আলকাসানী। মৃত্যু ৪৯৮ হিজরী। তিনি কর্ডোভার সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীদের ব্যাপারে তিনি 'তাকঈদুল মাহিল ওয়া তামঈযুল মুশকিল' নামে কিতাব রচনা করেন।

ইমাম ইবনে তুম্না'র জন্ম ভূমি

কর্ডোভা : কর্ডোভা অসংখ্য মুসলিম ক্ষণজন্মা মনীষীর জন্মভূমি। রোমের কিসরার হাতে গোড়াপত্তনের পর থেকেই কুরতুবা বা কর্ডোভা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে পরিচিত। ইসলাম পূর্ব যুগে এটি ছিল তৎকালীন শাসকদের রাজধানী। স্পেন মুসলিম শাসনাধীনে আসার পর সুলতান মাসউদের আমল থেকে কর্ডোভা স্পেনের রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। (নাফহুত্তীব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭)

ইবনে হাব্বান, রাযী ও হিজাযী লিখেছেন, রোম শাসক দ্বিতীয় কায়সার তানবিয়ান পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তাদের ইতিহাসের সূচনা ঘটে। সেটি ছিল ঈসা আ. এর জন্মের ৩৮ বছর আগের ঘটনা। কায়সার আন্দালুসের যমীনে বড় বড় শহরের গোড়াপত্তনের আদেশ জারী করেন। তার শাসনামলেই কর্ডোভা, শাবিলা, মারওয়া এবং সারকুসতার মতো বড় বড় শহরের গোড়াপত্তন হয়।

ইবনে হায়কাল লিখেছেন, কর্ডোভা ছিল স্পেনের শহরগুলোর মধ্যে পরিধি ও লোকসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় শহর। বলা হয় এটি তৎকালীন বাগদাদের দুটি অংশের প্রায় একটির সমান ছিল। (মু'জামুল বুলদান, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৩২৪)।

ইয়াকুত হামাভী কর্ডোভা সম্পর্কে লিখেছেন, কর্ডোভা শহর ছিল স্পেনের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি বড় শহর। খৃস্টান ও মুসলিম উভয় শাসনামলে এ শহর রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। মুসলিম সুলতানগণ এ শহরেই বসবাস করতেন। কর্ডোভা বহু কৃতী মানুষের জন্মভূমি।

বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কর্ডোভা শহর মুসলিম সুলতানদের বাসস্থান। স্পেনের রাজধানী জ্ঞান বিজ্ঞান ইলম ও উলামায়ে কেরামের। আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের জন্য একটি উর্বর স্থান। তাবেঈনের একটি বড় অংশ কর্ডোভা শহরে কাটিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন, দু'চারজন সাহাবীও কর্ডোভা শহরে জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। (নাফহুত-তীব-খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৮)

ইমাম রাযী লিখেছেন, কর্ডোভা ইসলাম ও ইসলাম পূর্ব উভয় যুগে রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছে। কর্ডোভা নদী স্পেনে অন্যান্য নদীগুলোর চেয়ে সবচেয়ে বড়। কর্ডোভা শহরে নদীর উপর যে ব্রীজ রয়েছে নির্মাণশৈলীর দিক থেকে এটি পৃথিবীর একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য। কর্ডোভা জামে মসজিদের মতো বড় মসজিদ মুসলিম দুনিয়ায় কমই রয়েছে।

ঐতিহাসিক আল হিজাযী কর্ডোভা শহরের বর্ণনায় লিখেছেন, বনু মারওয়নের শাসনামলে কর্ডোভা জ্ঞান বিজ্ঞান ইলম ও আলেমদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বহু আলেম সেখানে বসবাস করতেন। সাহিত্য সাধনার জন্যে দলে দলে লোক কর্ডোভায় পাড়ি জমাতো। কর্ডোভা ছিল অভিজাত ও জ্ঞানীদের মারকায। কর্ডোভা থেকে লোকজন নিজেকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে যেমন নিয়ে যেতে পারতো তেমনি পার্থিব সম্পদেও সম্পদশালী হতে পারতো। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের চেয়ে এখানকার আলেমদের মর্যাদা কোন অংশেই কম ছিলো না। কর্ডোভার ময়দান ছিল সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র, আধুনিক ঘোড়া ও জঙ্গী তৎপরতার প্রাণোচ্ছল ক্ষেত্র। স্পেনে কর্ডোভার অবস্থান ছিল মানবদেহে মাথার মতো। কর্ডোভার অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট ছিল প্রশস্ত এবং বহির্দৃশ্য ছিল দৃষ্টিনন্দন এবং অবকাঠামো ছিল খুবই সুন্দর। কর্ডোভা শহর একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা করতো। (প্রাগুক্ত)

অনুবাদ : আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা : ১০৫-১০৬

মৌল কর্তব্য : আল-কুরআনের বিধান

মু. শওকত আলী

যাকাত :

১. আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও মূলত এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। (সূরা রূম : আয়াত ৩৯)

২. ঈমান আনয়ন কর আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর এবং ব্যয় কর সেসব জিনিস হতে যে সবের উপর তিনি তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক ঈমান আনবে এবং সম্পদ ব্যয় করবে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিফল। (সূরা হাদীদ : আয়াত ৭)

দান-খয়রাত

১. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কোন জিনিস তাদের ব্যয় করা উচিত। তাদেরকে বলো, তোমরা ব্যয় করো তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এতীম, অভাবী এবং পথিকের জন্য এবং তোমরা যা কিছু ভালো করো সবই আল্লাহ অবহিত। (সূরা বাকারা : আয়াত ২১৫)

২. এই সদাকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকীনদের জন্য আর তাদের জন্য যারা সদাকাসমূহ উসূলের কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সংগে দাস মুক্তির জন্য ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এ বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (সূরা তওবা, আয়াত ৬০)

৩. অতএব হে (ঈমানদার লোকেরা) আত্মীয়কে তার হক পৌছে দাও। আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটাই উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তোষ চায়। আর তারাই কল্যাণলাভে সক্ষম হবে। (সূরা রূম : আয়াত ৩৮)

মজুদদারীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১. নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) লোকদের উপর গালাগাল এবং (পেছনে) দোষ প্রচার করে।

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

২. যে লোক ধন সঞ্চয় করে এবং তা বারবার গুণে।
৩. সে মনে করে যে, তার ধন সম্পদ চিরকাল সঞ্চিত থাকবে।
৪. কখনও নয়, সে ব্যক্তি তো অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। (সূরা হুমাযা : আয়াত ১-৪)

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ন্যায়বিচার ও ন্যায়আচরণ

১. আর তুমি লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সাথে করো। (সূরা নিসা : আয়াত ৫৮)
২. আর বিচার ফয়সালা (কারো মধ্যে) করলে ঠিক ইনসাফ মোতাবেকই করবে। কেননা আল্লাহ ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪২)
৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের ধারক হও ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও, তোমাদের এ সুবিচার ও এ সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়দের উপরই পড়ুক না কেন। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এ অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খায়েসের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন রাখা কথা বলো কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাকো তবে জেনে রাখো তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। (সূরা নিসা : আয়াত ১৩৫)
৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত না করে যার ফলে তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো। বস্তুত তাকওয়ার সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৮)

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইলঃ ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (...)।

স্বাক্ষর স্বাক্ষর

ম্যানেজার

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন ২০ কপির উর্ধে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৩৫X৪ = ১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫X৮ = ২৮০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫X১২ = ৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে। যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস
২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ
৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা
৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার
৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন
৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম
৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি

লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

১৪ শ্যামলী রিং রোড, পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা), শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহবান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রহাক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্যে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

পাঠকের মতামত আমরা আগ্রহ সহকারে ছাপাই।

গ্রাহক চাদার হার

প্রতি সংখ্যা : টাকা ৩৫, প্রতি ৬ মাসে : টাকা ৭০, প্রতি বছরে : টাকা ১৩০

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : October-December -2006, TK : 35